কথামৃতে না বলা শ্রীরামকৃষ্ণ কথা ও

শ্রীম'র

জীবন ও সাধনা

অরুণেশ কুণ্ডু

কথামৃতে না বলা শ্রীরামকৃষ্ণ কথা ও

শ্রীম'র জীবন ও সাধনা

কথামৃতে না বলা শ্রীরামকৃষ্ণ কথা ও

শ্রীম'র

জীবন ও সাধনা

অরুণেশ কুণ্ডু

২২/সি কলেজ রো
কলকাতা—৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পিতৃদেব নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু
এবং
মাতৃদেবী সুমতিরানী কুণ্ডুর
স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের কথা

বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে শ্রীসারদা মঠ (দক্ষিণেশ্বর)—এর বাংলা মুখপত্র 'নিবোধত'—এর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)—এর একটি যথাযথ জীবনী রচনার জন্য অনুরোধ আসে আমার কাছে। সেই অনুরোধ রক্ষার তাগিদে শ্রীম সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থাদি, বিশেষ করে স্বামী নিত্যাত্মানন্দ রচিত 'শ্রীম—দর্শন' (পনেরো ভাগ) গ্রন্থমালা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করি। তখনই মনে হয়, কি সাধু, কি গৃহী, আদর্শ জীবন গঠনের জন্য এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত শ্রীম'র উপদেশাবলী অতুলনীয়। তাই জীবনী রচনার তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি স্বতন্ত্রভাবে উপদেশগুলিও সংগ্রহ করতে শুরু করি। একই সঙ্গে নজরে আসে কথামৃতে না বলা কিন্তু 'শ্রীম—দর্শন' গ্রন্থমালায় বলা বেশ কিছু শ্রীরামকৃষ্ণ কথা এবং শ্রীম—কৃত শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ। এগুলিও সংগ্রহ করি। এগুলি 'শ্রীম—দর্শন' গ্রন্থমালার প্রতিটি ভাগের প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

জীবনীটি 'নিবোধত' ত্রৈমাসিক পত্রিকার চতুর্দশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা (জুলাই, ২০০০ খৃষ্টাব্দ) থেকে পঞ্চদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা (জুলাই, ২০০১) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পাঁচ ভাগে প্রকাশিত হয়।

অনেক পরে, অনুজপ্রতিম শ্রী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হে মানবজীবন' পাক্ষিক পত্রিকায় শ্রীম'র উপদেশগুলি 'শ্রীম—দর্শন' গ্রন্থমালার প্রথম ভাগ থেকে পঞ্চদশ ভাগ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে মে, ২০০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে জানুয়ারী ২০১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩১টি পর্বে প্রকাশিত হয় প্রতিটি ভাগের পৃষ্ঠানুক্রমিক ভাবে।

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম ভাগে আছে কথামৃতে না বলা শ্রীরামকৃষ্ণ কথা এবং শ্রীম—কৃত প্রসঙ্গ: শ্রীরামকৃষ্ণ। দ্বিতীয় ভাগে আছে শ্রীম'র জীবন ও সাধনা এবং তৃতীয় ভাগে আছে শ্রীম প্রদত্ত উপদেশাবলী। এই উপদেশগুলি সাধ্যমত বিষয় ভিত্তিক ভাবে ভাগ করে নানাবিধ প্রসঙ্গ হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। প্রতিটি উপদেশেরই শেষে সেটি 'শ্রীম—দর্শন' (১ম সং) গ্রন্থমালার কোন ভাগের কোন পৃষ্ঠায় আছে, তার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সবিনয়ে নিবেদন করি, আমার সাধ্যমত চেষ্টা সত্বেও ''শ্রীম—দর্শন'' গ্রন্থমালার সব কটি ভাগেই হয়তো আরো কিছু উপদেশ আমার সচেতন দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এ জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রথম বন্ধনীর মধ্যের শব্দ বা শব্দাবলী স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীর এবং তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যের শব্দ বা শব্দাবলী গ্রন্থকারের।

শ্রীম'র উপদেশগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন চণ্ডিগড়—স্থিত ''শ্রীম ট্রাষ্ট''—এর সম্পাদক ও ট্রাষ্টি শ্রী নীতিন নন্দ ১২ই মার্চ, ২০০৮ খৃষ্টাব্দে।

শুভ রাসযাত্রা, ১৪২৩
কলকাতা—৭০০ ০৪২

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ : সংসার

প্রসঙ্গ : কর্ম

প্রসঙ্গ : মানব দেহ

প্রসঙ্গ : মন এবং বুদ্ধি

প্রসঙ্গ : মায়া এবং মহামায়া

প্রসঙ্গ : যোগ এবং যোগী

প্রসঙ্গ : জ্ঞান এবং জ্ঞানী

প্রসঙ্গ : ত্যাগ

প্রসঙ্গ : ভিক্ষা

প্রসঙ্গ : তীর্থ

প্রসঙ্গ : বিবিধ

প্রথম ভাগ

কথামৃতে না বলা শ্রীরামকৃষ্ণ কথা
ও
শ্রীম—কৃত প্রসঙ্গ : শ্রীরামকৃষ্ণ

SRI MA TRUST
579, Sector 18-B,
Chandigarh 160 018, India
Phone: 91-172-272 44 60
http://www.kathamrita.org
e-mail: SriMaTrust@Yahoo.com

Dated: 12 March 2008

TO

Mr. Arunesh Kundu
31/K, N.K. Ghosal Road
Kasba, Kolkata - 700 042.
Tel.: 033-24150543
Mob.: (0)9432348518

Subject: Approval for publishing book with quotes from *SRI MA DARSHAN*

Dear Sir,

Salutations to Guru, Thakur and Holy Mother!

Please refer to your email regarding publishing a booklet containing quotes from SRI MA DARSHAN, Bengali.

We hereby give you the approval for printing the same. You are requested to send us three copies of the book when the book gets published.

Thanks & regards,

Nitin Nanda
(Secretary & Trustee)

Donations to Sri Ma Trust are exempt under section 80G of the Income Tax Act 1961. All donations and payments are accepted in favour of SRI MA TRUST only.

কথামৃতে না বলা শ্রীরামকৃষ্ণ কথা

ঠাকুর—ধ্যানের দৃষ্টান্ত এই তিনটি—যখন আকাশে মেঘ হয় আর বায়ু বন্ধ থাকে; যখন খুব বড় সরোবরে জল নিশ্চল থাকে; [আর] নিবাত নিষ্কম্প অগ্নিশিখা। (শ্রীম দর্শন—১ম ভাগ: পৃষ্ঠা—১৮৪)

ঠাকুর—যাঁর কাছে বসলে, যাঁর সঙ্গ করলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় তিনিই সাধু। (১/১৯৯)

ঠাকুর—টাকা থাকলে অর্ধজীবন্মুক্ত—যদি মন ঈশ্বরে থাকে। (১/২২৫)

ঠাকুর (শ্রীমকে)—যেখানে যা দরকার, তিনি [ঈশ্বর] সব সাজিয়ে রেখেছেন। তোমার কাজ কিসে তাঁরে লাভ হয়; তাঁকে ডাকো। (১/২৫৮)

ঠাকুর—যাদের মন ঈশ্বরে আছে তারা কারো ভয় করে না, কারো খোসামোদ করে না। ভগবান যা দেন তাতেই সন্তুষ্ট। (১/২৬৩)

ঠাকুর (শ্রীমকে)—ঈশ্বর, মা, আর আমি এক। (১/৩৩৪)

ঠাকুর (নরেন্দ্রনাথকে)—গৌরাঙ্গের নাম শুনেছিস, এই যে লোক 'গৌর গৌর' করে, আমি সেই গৌরাঙ্গ। (২/৫৪)

ঠাকুর—তিন থাকের লোক করেছেন ঈশ্বর। প্রথম যোগী। তাঁরা সর্বদাই তাঁর চিন্তায় মগ্ন। ... আবার যোগ—ভোগ, এও একটি থাক, এও ভাল। দুই দিকই আছে। ... আর শুধু ভোগ, এও একটি থাক আছে। এরা খালি ব্যস্ত। এদের দ্বারাই এই সৃষ্টি রক্ষা করছেন। (২/৯৩)

ঠাকুর—এখানকার বড় আর এক রকমের। যার ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন মজে আছে তিনিই বড়। আর সংসারে কে বড়? যার অনেক লোকজন, বাড়ীঘর, বিষয় সম্পত্তি কিংবা নানা বিদ্যা অছে। কিন্তু এখানে তা নয়—ঠিক উল্টো, যিনি ঈশ্বর ভক্ত তিনি বড়। (২/১০৬)

ঠাকুর (বেড়াতে বেড়াতে ট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে পড়ে রাস্তা দেখে)—আহা ঠিক যেন সাধুর হৃদয়—সোজা আর প্রশস্ত। (২/১১৩)

ঠাকুর (শ্রীমকে)—দেখ, এই মুখ দিয়ে তিনি কথা কন। (২/১৪৫)

ঠাকুর—কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলেই ব্যাকুলতা হয় ঈশ্বরের জন্য। (৩/৫)

ঠাকুর (নরেন্দ্রনাথকে হাতের পাখাটি দেখিয়ে)—এই পাখাটি যেমন দেখছি, তেমনি দেখা যায় ঈশ্বরকে। (৪/৮৯)

ঠাকুর—যার যেটি ভালো লাগে সে সেটি চিন্তা কর—নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে। (৪/১২৩)

ঠাকুর—'আমার পুত্র' বলতে নেই। বলবে, 'ভগবানের পুত্র' আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন। (৪/১৪৩)

ঠাকুর—সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরীয় কথা শোনা সহজ সাধন। (৪/২৫৪)

ঠাকুর—নির্জনে গোপনে ন্যাংটা হয়ে তাঁকে ডাকবে। (৪/৩০৬)

ঠাকুর—লক্ষ্মীছাড়া হওয়ার চাইতে কৃপণ হওয়া ভালো। (৪/৩১০)

ঠাকুর—সব রকম অভ্যাস রাখতে হয়। রাঁধা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘরদোর ঝাড়ু দেওয়া—এ সব জেনে রাখতে হয়। শরীর ধারণের জন্য যা যা দরকার এ সবই জানা উচিত। ... এ সব বিষয়ে যে পরাধীন তার ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। (৪/৩১৫)

ঠাকুর (শ্রীমকে)—দেখ, যখন ভিতর ত্যাগ হয়ে যায় তখন বাইরে আপনি ছেড়ে যায়। (৫/৪৯)

ঠাকুর (অন্তরঙ্গদের)—তোমরা চিন্তামণির খদ্দের। (৫/৪৬)

ঠাকুর—যখন আত্মা আলাদা আর শরীর আলাদা বোধ হয়, তখনই ধর্মজীবন ঠিক ঠিক আরম্ভ হয়। (৫/২২১)

ঠাকুর—সুখের চাইতে দুঃখ ভালো। প্রবৃত্তির চাইতে নিবৃত্তি ভালো। এতে মন তাঁর [ঈশ্বরের] দিকে থাকে। (৫/২২৫)

ঠাকুর—ভক্তি কি? না কায়মনোবাক্যে তাঁর [ঈশ্বরের] ভজনা। (৬/১৬)

ঠাকুর—ছেলেকে ভালবাসবে, সেবা করবে, কিন্তু গোপালভাবে। (৬/৩০)

ঠাকুর—যে রাস্তায় মহাপ্রসাদ যায়, যে মহাপ্রসাদ বয়ে আনে, সেই রাস্তা ও সেই ব্যক্তি পবিত্র হয়ে যায়। (৬/১৮৯)

ঠাকুর—মহাপ্রসাদ। এ খেলে ভগবানে ভক্তি বিশ্বাস বাড়ে। (৭/২০)

ঠাকুর—অন্ততঃ তিন হাত তফাৎ থাকতে হয় বিষয়ীদের থেকে। বিষয়ীদের সঙ্গে জ্ঞানের কবাট বন্ধ হয়ে যায়। (৭/১২৪)

ঠাকুর—সাধুদের প্রণাম করলে সংসার অনিত্য বলে বোধ হয়। (৭/২৩৭)

ঠাকুর—টাকায় অবসর দেয়, অন্যের গোলামী করতে হয় না পেটের জন্য। সব সময় তাঁকে [ঈশ্বরকে] নিয়ে থাকা যায়। চাকরী করলে সব সময় ওতে চলে যায়। ঈশ্বরকে ডাকবে কখন? (৭/২৪৪)

ঠাকুর—তাঁতে [ঈশ্বরে] অরুচি হয় না, তৃপ্তিও মিটে না। যত নাও আরও চাই। (৮/৪৬)

ঠাকুর—কলিকালে সাধুসঙ্গই ধর্মলাভের একমাত্র পথ। (৮/৫৩)

ঠাকুর—এই মানব শরীরেই প্রেমভক্তি, জ্ঞান, ভালবাসাবাসি, নাচানাচি, এই সব দিব্যলীলা প্রকাশ সম্ভব। (৮/৯৯)

ঠাকুর—ঠিক হয়ে বসে থাকো যে যেখানে আছ। আর বসে বসে কাঁদো। আমি ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবো। (৮/১৭২)

ঠাকুর (একজন যুবক ভক্তকে)—এই উঠন্ত যৌবন। এখনই তাঁকে [ঈশ্বরকে] ডাকবার সময়। তাঁর সেবায় লাগাও এই যৌবন। (৮/২৪৫)

ঠাকুর (অন্তরঙ্গদের প্রতি)—এখানে অন্য কেউ নাই। সব আপনা আপনি। বড় গুহ্য কথা। কারো শোক ভুলতে হলে তার দোষ সর্বদা মনে করবে। দোষ মনে করলে শোক কমে যাবে। (৯/১০৫)

ঠাকুর—ধ্যানে পুকুরের মাছ গিয়ে যেন সমুদ্রে পড়লো। (১০/১৭)

ঠাকুর—দেবস্থানে দীনহীন ভাবে যেতে হয়, কষ্ট করে, পায়ে হেঁটে। (১০/২৩)

ঠাকুর—ভগবানে একটু ভালবাসা হলে মন অমনি স্থির হয়ে যায়। টানাটানি করতে হয় না। (১০/৩১)

ঠাকুর—ঈশ্বরে ভক্তি হলে, তাঁকে ভালোবাসলে কাম—ক্রোধাদি নষ্ট হয়ে যায় অমনি। (১০/৩১)

ঠাকুর—ব্রহ্ম, শক্তি, অবতার, ভক্ত—একই চার, চারই এক। লীলায় ভাগ ভাগ হয়। (১০/৪৯)

ঠাকুর—যার কাছে বসলে, যার সঙ্গে আত্মীয়তা করলে কেবল ঈশ্বরের কথা মনে হয়—মনে হয় ঈশ্বর সত্য, তিনি সৎ। তাঁর সঙ্গ করা চাই। (১০/১৬২)

ঠাকুর—যাদের অনেক কাজ, তাদের সহায় যোগ। (১০/২১৯)

ঠাকুর—অধ্যাপনা ঋষিদের কর্ম। অতি শুদ্ধ কর্ম। ছল—চাতুরী নাই। ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের অনুকূল। ব্রহ্মবিদ্যার পরই স্থান লৌকিক বিদ্যার। বিদ্যার অনুশীলনে বুদ্ধি তীক্ষ্ন ও মার্জিত হয়। এই বুদ্ধি ব্রহ্মবোধের সহায়ক। (১১/১১৬)

ঠাকুর—শরীর ধারণ মানেই কর্ম। শরীরই কর্ম। কর্মের বন্ধন অবশ্যম্ভাবী, তাই যে কাজ সামনে এসে পড়ে তাই করবে। কিন্তু এর ফলভোগ নিজে নেবে না। যতটুকু নইলে নয়, ততটুকু নেবে। যেমন বড় ঘরের দাসী নেয়। (১১/১১৭)

ঠাকুর—ভালমন্দ সব কাজ তাঁর [ঈশ্বরের]। এই ভাবে যে কর্ম করে, কর্ম বন্ধন তাকে ছেড়ে দেয়। (১১/১১৭)

ঠাকুর—যে সব কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে, ভগবান তার হাতের মুঠোয়। (১১/১১৭)

ঠাকুর—পূর্বাপর সব না জেনে ঈশ্বরের কার্যের সমালোচনা করতে নেই। (১১/১৪৫)

ঠাকুর—আনন্দ কর, আনন্দ কর। আনন্দময়ীর সন্তান সব, আনন্দ কর। (১২/১০)

ঠাকুর—সাধুভক্তের সেবা করতে হয়। ... গুরুজনদের সেবা করতে হয়। আর যাদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া যায়, তাদেরও সেবা করা উচিত। (১৩/৩৭)

ঠাকুর—ভক্ত সংসারেই থাকুক, আর সন্ন্যাসীই হোক, তার দাম লাখ টাকা। (১৪/১৬১)

ঠাকুর—সাধকের অবস্থায় মেয়ে মানুষ—কালসাপ, রাক্ষসী, দাবানল, বাঘিনী। এগুলি সবই মানুষের প্রাণ হরণ করে। (১৪/২২৫)

ঠাকুর—কলিতে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, বৃন্দাবনের রজঃ—আর গঙ্গাজল— সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। (১৪/২৭২)

ঠাকুর—প্রারব্ধও বদলে যায় ঈশ্বরের কৃপা হলে। (১৫/৫৯)

ঠাকুর—ঈশ্বরকে যত দেখ তত দেখতে আকাঙ্খা হয়। নিবৃত্তি নাই। (১৫/৪০৫)

শ্রীম—কৃত প্রসঙ্গ : শ্রীরামকৃষ্ণ

● ঠাকুর বলতেন সন্ধ্যা করতে। ওতে নিত্য প্রাণীহত্যা জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। আর ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। আবার দৈনন্দিন কার্যের ভাল মন্দ ধরা পড়ে ঐ সময়ে বসলে। (১/৩৬)

● ধ্যানই কর আর সমাধি লাভ কর, যাই কর test হচ্ছে ওখানে— তুমি তাঁর [ঈশ্বরের] সঙ্গে দেখা করে কথা কয়েছ কি না। তা না হলে কিছুই হল না। ... ঠাকুর এসেছিলেন এই কথা বলতে, অবতার আসেন এই জন্য। ... দর্শন আবার কথা কওয়া এই হল test. (১/১০৪)

● ঠাকুরকে ধ্যান করলেও অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যিনি বাক্যমনের অতীত, তাঁকেই ধ্যান করা হয়। (১/২৩২)

● ঈশ্বর আছেন এইটি প্রমাণ করতে [ঠাকুর] এসেছিলেন। তিনি তাঁকে [ঈশ্বরকে] দর্শন করেছেন নানাভাবে—সাকার নিরাকার। আবার অন্তরঙ্গদের ঈশ্বর দর্শন করিয়েছেন। আবার যারা তাঁকে [ঠাকুরকে] দর্শন করে নাই, কি পরে জন্মাবে তারা যদি তাঁকে [ঠাকুরকে] আন্তরিক চিন্তা করে, তারাও ঈশ্বর দর্শন করবে তাঁর [ঠাকুরের] কৃপায়। (১/১৮৬)

● যারা ঠাকুরকে ভাবে, তাঁর চিন্তা করে, তাদের আবার মন্ত্রই বা কি? আর দীক্ষাই বা কি? তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর অবতার। (১/২৮৬)

● ঠাকুরের নাম মহামন্ত্র এ যুগে। (১/৩৯৭)

● ঠাকুর বলেছিলেন, একটি slender (সূক্ষ্ম) লাইন। এটার এপার পশুত্ব মনুষ্যত্ব—পার হলেই দেবত্ব। লাইনটি হল ভোগ বাসনার। অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনের। কামিনী কাঞ্চন ছাড়লেই দেবতা। (২/৭৮)

● কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে ভাব ভক্তি প্রেম হয়। ঠাকুর একে ভক্তি যোগ বলতেন। (২/২১২)

● ঠাকুর বলতেন—"জগতে অনবরত গান হচ্ছে"। একদিন রাত দুটো তিনটের সময় পোস্তায় বেড়াতে বেড়াতে এ কথা বলেছিলেন। এরই নাম অনাহত শব্দ। (২/২৯১)

● ঠাকুরের তখন অসুখ। একজন ভক্ত তাঁকে বলছেন—আপনাকে দেখে তৃপ্তি [আশ?] মেটে না। ঠাকুর সস্নেহে উত্তর করলেন—হ্যাঁ ভগবানকে দেখে তৃপ্তি মেটে না। (৩/৩০৭)

● ঠাকুরের যত উপদেশ আছে এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, আদিতে সাধুসঙ্গ, মধ্যে সাধুসঙ্গ, আর অন্তে সাধুসঙ্গ। (৪/২৩)

● ঠাকুর সন্ধ্যার পর প্রায়ই "গুরু গঙ্গা গীতা গায়ত্রী", এই মন্ত্রটি আবৃত্তি করতেন। এটি একশো বার জপ করলে ভিতর বাহির এক হয়ে যায়। (৪/২৮)

● একদিকে সর্ব ধর্মের সমন্বয়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও সমন্বয় নারায়ণে—এই মহাকার্যটি করে গেছেন পরমহংসদেব জগতের কল্যাণের জন্য। (৪/৩২)

● যারা যেত তাঁর কাছে, অন্তরঙ্গরা, তাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক শিক্ষা দিতেন। (৪/৩১৬)

● তিনি নিজেই ভক্ত ও ভগবান উভয়ই। (৫/১১৭)

● ঠাকুরের দৃষ্টি একেবারে 'মা'র উপর। তিনি দেখছেন মানুষ কিছু করে না। সবই তিনি—মা করছেন। তাই কাকে বাদ দিবেন আর? তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বসংসারই আনন্দের হাট—নিরানন্দ কোথায়? (৫/১৮৭)

● প্রথমে ত্যাগ চাই। পরে ঈশ্বরই সব, এই বুদ্ধি হয়। একে ঠাকুর বলতেন বিজ্ঞানীর অবস্থা। দুই—ই বেদান্ত। (৫/২৫০)

● ব্রহ্ম, শক্তি, জীবজগৎ, তপস্যা, জীবের কর্তব্য—এই সব বোঝাতে, এই সব দেখাতে ব্রহ্মই যুগে যুগে মানুষ হয়ে আসেন। ঠাকুর সেই ব্রহ্ম [তাঁর] নিজের মুখের কথা। (৫/২৫১)

● ঠাকুরের একটি কথা সারা জীবন চিন্তা করলেই ঢের। কি কাজ বেশী কথায়! (৬/১৬)

● সাধুদের শত দোষ থাকলেও ঠাকুর তাঁদের দোষ ধরতেন না। (৬/১২৬)

● ঠাকুরের সব কথা আসছে মহাকারণ থেকে, তাই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ভেদ করে মানুষের মনকে একেবারে মহাকারণে নিয়ে যায়। জগৎ ভুল করিয়ে দেয় ঐ কথা। পরমানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় অজ্ঞাতে ঐ কথা শুনে। তাই শোক তাপ ভুলে যায় লোক। ভগবানের এই রূপ মন প্রাণ ভোলানো মাদকতা, এই জগৎ ভোলানো আকর্ষণ। (৬/১৬৫)

● [ঠাকুরের নৃত্য প্রসঙ্গে] ব্রহ্মভাবটির নির্বাক প্রকাশ হচ্ছে ঐ নৃত্য। ভাবকে প্রকাশ করে ভাষা। ঠাকুরের ঐ নৃত্যটি হল ভাষা—অন্তরের ব্রহ্মভাবটি প্রকাশের। তাই মন প্রাণ হরণকারী। (৬/২৯৮)

● এই তেজ বীর্যহীন কলি কাল। এখন গুরু না হলে উপায় নাই। তাই ভগবান এই মাত্র গুরু হয়ে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। ঠাকুর জগদগুরু। তাঁর আশ্রয় নিয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে চল। (৭/১৮)

● 'নির্দোষ' এক ভগবান। আর দেখেছি তাঁরই অবতার রূপ ঠাকুরকে। ঠাকুরও "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম"। ব্রহ্ম ও জগতের সন্ধিস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ। (৭/৬৫)

● ঠাকুরের কাছে ভালো, যাতে মন ভগবানের যায় তাই, আর সব মন্দ। (৭/৬৭)

● ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ হলেও দেহধারী মাত্রই শক্তির এলাকায়। তা জীবই হউক কি অবতারই হউক। তাই শক্তির পূজা দরকার। এই সত্যটি জগৎকে শেখাবার জন্য [ঠাকুর] শক্তির আরাধনা নিজে করলেন। (৭/৬৯)

● তিনি [ঠাকুর] নিজেই শক্তি, নিজেই ব্রহ্ম আবার নিজেই ভক্ত। (৭/৬৯)

● ঠাকুরের প্রধান কাজটি ছিল ভারতের ও জগতের সমষ্টি মনটিকে ব্রহ্মে তুলে ধরা। (৭/১৭০)

● False [মিথ্যা] অহঙ্কারটা ধরা পড়লেই হয়ে গেল। তখন গুরুবাক্যে বিশ্বাস হয়। গুরুবাক্যে বিশ্বাস একমাত্র উপায়, ঠাকুর বলতেন। বিশ্বাসে চোদ্দ পনর আনা হয়ে যায়। বাকীটা তাঁর কৃপায় ক্রমশ হয়ে যায়। (৮/৭৬)

● ঠাকুরকে আন্তরিক যারা ভালবাসে বুঝতে হবে তাদের ভিতরে সন্ন্যাস হয়ে গেছে। তাঁর ইচ্ছা হলে কারুকে আবার বাইরের সন্ন্যাসও দেন। (৮/১৭৭)

● ঠাকুরের কথা যাদের শুনতে ভাল লাগে তারা উঁচু ঘরের লোক। (৮/১৭৯)

● [ঠাকুর] অত [এত?] ভালবাসতেন যে, ঐ ভালবাসায় সংসারের সকল যন্ত্রণার অবসান হয়ে যেত, এই যন্ত্রণা—সমুদ্রের ভিতর বাস করেও। (৯/৩৩)

● অধর সেনের দেহত্যাগ হলে কেঁদেছিলেন ঠাকুর। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন—"মা কেন আমায় ভক্তি দিয়ে বেঁধে রাখলে?" ভক্তিতে মন নিচে থাকে। তাই ভক্তের জন্য শোক। ভক্ত বেঁচে থাকুক, এই ইচ্ছা। (৯/৪৬)

● [ঠাকুরকে] অন্তরঙ্গরা ঈশ্বরভাবে নিয়েছেন—প্রকাশ্যভাবে নিয়েছেন। সে কি তাঁদের choice? তিনি তাঁদের নিকট নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের শক্তি দিয়েছেন তাঁকে চিনতে। তবেই তাঁরা বলছেন, তিনি ঈশ্বর। (৯/২২৫)

● তাঁর [ঠাকুরের] স্মৃতিই জীবন। তাই অমৃত। তাই আনন্দ, তাই শান্তি, তাই সুখ। (৯/২৩০)

● গানে খুব শীঘ্র head and heart এক হয়ে যায়। তাই ঠাকুর নির্জনে গান গাইতে বলেছিলেন। (১০/১৩)

● মননের সময়ও সঙ্কট থাকে। তারপর সিদ্ধান্ত লাভ হলে ঐ এক চিন্তা নিয়ে পড়ে থাকা। এ অবস্থায়ই head and heart (বুদ্ধি ও হৃদয়) এক হয়ে যায়। একেই ঠাকুর বলতেন, মন—মুখ এক করা—word, thought and realisation এক হয়ে যায়। (১০/১৩)

● ঠাকুর যে ঈশ্বর এটা জানা হলেই সব জানা হল, সব লাভ হল। (১০/৪০)

● ভক্তরা যে ঠাকুরের কথা নিয়েছে, তা কি কৃপা করে নিয়েছে? তা নয়। ভালবাসায় তাদের কিনে ফেলেছেন ঠাকুর। তারপর যা দুর্লভ বস্তু ভগবান তাঁর দর্শন করিয়ে দিয়েছেন। এও দর্শন করিয়ে দিয়েছেন, তিনিই ভগবান (১৩/৪০)

● ঠাকুর আমাদিগকে চিনিয়ে দিয়েছেন—যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ— বাক্যমনের অতীত, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ব্রহ্মশক্তি। তিনিই মা কালী। (১৩/৫২)

● যেমন ফিনকি [চকমকি?] পাথর দিয়ে লোহাতে আঘাত করলে আগুনের জন্ম হয়, তেমনি [ঠাকুরের পদরেণু পূত] ঐসব স্থানের পরমাণুতে মনের চিন্তার পরমাণু দিয়ে আঘাত করলে চৈতন্য উৎপাদন হয়। মানুষ শিব। তার জীব ভাব দূর হয় ঐ সব স্থানে ধ্যানে। (১৩/৬৬)

● তিনি [ঠাকুর] দেখিয়ে দিলেন মূল সত্যটি চিরকাল সত্য। ব্যাকুল হলে এখনও ভগবান এসে কোলে তুলে নেন। অবশ্য নেবেন। অতীতে নিয়েছেন, এখনও নিচ্ছেন। ভবিষ্যতে [ও] তিনি নেবেন (১৪/১৬৫)

● বেদে যাঁকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলে, সেই পুরুষই ঠাকুর। তাঁর সেবায় সদ্যমুক্তি। (১৪/২১৪)

● ঠাকুরের আর্ট ছিল দিব্য, অতুলনীয়। সমাধি, নৃত্য, ইঙ্গিত, ইশারা, কথা ও কার্যে মানুষের হৃদয় পথে ঈশ্বরীয় ভাব প্রস্ফুটিত করে দিত। তাতে মনের গ্রন্থি খুলে যেত, জন্ম—জন্মান্তরের মনের ময়লা নির্মূল হয়ে যেত। (১৪/২৭৩)

● রোগ যন্ত্রণা তাঁকেও ভোগ করতে হয়েছে জীবের শিক্ষার জন্য। কিন্তু অত অসুখের ভিতরও ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করছেন। (১৫/২৪২)

● ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলেছিলেন, "তোমরা কেবল আমার চিন্তা কর। আমি তোমাদের সকল কর্তব্য করে দেব।"—কি কর্তব্য করে দেবেন? অর্থাৎ মানুষের আত্মদর্শনের সহায়তা করবেন। (১৫/২৪৯)

● মা আর ঠাকুর এখন আলাদা। বস্তুতঃ ঠাকুরই মা, মা'ই ঠাকুর। লীলায় এসেছেন তাই দু'টি। একটি ছেলে, একটি মা। ঠাকুরের দেহ মনটা দিয়ে জগদম্বা বায়োস্কোপের মত আধ্যাত্মিক অলৌকিক সব ছবি দেখাচ্ছেন। (১৫/৩২৪)

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীম'র জীবন ও সাধনা

[ভূমিকা : ২ জুন, ১৯২৪ খৃস্টাব্দ, সোমবার। সকাল প্রায় নটার সময় বেলুড় মঠ থেকে ব্রহ্মচারী ভৈরবচৈতন্য এসেছেন শ্রীম'র কাছে। স্বামী শুদ্ধানন্দ তাঁকে পাঠিয়েছেন। ব্রহ্মচারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ—পার্ষদদের জীবনকথা সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রথাগত জীবনীতে যে—ধরনের তথ্যের সমাবেশ থাকে সেই ধরনের তথ্যাদি ব্রহ্মচারীকে জানাতে শ্রীম অনিচ্ছুক। তবুও যখন ব্রহ্মচারী বললেন, লোক ক্রমবিকাশ দেখতে চায়, শুধু সত্য ধরতে পারে না, তখন গভীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সামান্য কিছু কিছু পারিবারিক তথ্য দিয়ে শ্রীম ব্রহ্মচারীকে বললেন, ''আপনি যখন প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন বাবার নাম কী, তখনই আমি বলতে যাচ্ছিলাম—পরমহংসদেব। কিন্তু আপনি জানতে চান দেহটা কোত্থেকে এসেছে, তাই ওটা (জন্মদাতা পিতার নাম) বললাম। Life লেখা কি এই ঘটনার পর এই ঘটনা? Life হল history of one's mind and soul. আর সে তো চার পার্ট 'কথামৃত'তেই (পঞ্চম ভাগ 'কথামৃত' তখনও বেরোয়নি) রয়েছে। ওই বইতে খুঁজলে সব পাবেন। তবে ওটা আপনার কর্ম নয়—এই থেকে সব বের করে একটি মালা গাঁথা।'' (শ্রীম—দর্শন, ৭ম ভাগ পৃঃ ২৪—২৬)

জীবনী লেখা সম্বন্ধে শ্রীম'র এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে এ—পর্যন্ত তাঁর কোনও জীবনী লেখা হয়নি। অবশ্য ছোট আকারে শ্রীম'র একাধিক জীবনী লিখিত হয়েছে। 'শ্রীম—দর্শন' গ্রন্থমালার লেখক স্বামী নিত্যাত্মানন্দ (পূর্বাশ্রমে যাঁর নাম ছিল জগবন্ধু রায়) দীর্ঘদিন শ্রীম'র ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন, সন্ন্যাস নেওয়ার আগে এবং পরেও। শ্রীম'র মতোই তিনিও নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। তাতে থাকত শ্রীম কথিত যাবতীয় অধ্যাত্মপ্রসঙ্গের অনুপুঙ্খ বিবরণ এবং আনুষঙ্গিক তথ্যাদি। ১৯৬০ খৃস্টাব্দ থেকে এই বিবরণ 'শ্রীম—দর্শন' নামে গ্রন্থাকারে পনেরো ভাগে প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর ইচ্ছা ছিল শ্রীম'র একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করার। কিন্তু হঠাৎ তাঁর দেহাবসান হওয়ায়, তা আর সম্ভব হয়নি।

শ্রীম'র সংক্ষিপ্ত জীবনীগুলি যে—ধাঁচে রচিত, বর্তমান রচনাতে তা পরিহার করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর সঙ্গেই পারিবারিক জীবনের উত্থান—পতনের কালানুক্রমিক বিবরণসহ তাঁর সাধনজীবনের ধারাবাহিক বিবরণ এবং 'কথামৃত' রচনা, প্রকাশ ও প্রচারেরও কালানুক্রমিক বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রণেতা শ্রীম, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর কাছে সাদর শ্রদ্ধায় 'মাস্টারমশাই' নামে উল্লিখিত হন, তাঁর পিতৃদত্ত নাম মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। পিতা—মধুসূদন গুপ্ত, মাতা—স্বর্ণময়ী দেবী, তাঁদের চার পুত্র ও চার কন্যা। মহেন্দ্রনাথ তৃতীয় পুত্রসন্তান। শোনা যায়, দীর্ঘকাল শিবের আরাধনা করেই তবে তাঁর পিতামাতা তাঁকে সন্তানরূপে লাভ করেন। শ্রীম'র জন্ম ১৪ জুলাই, ১৮৫৪ ; বাংলা ৩১ আষাঢ়, ১২৬১ সাল, শুক্রবার, শতভিষা নক্ষত্রে, নাগপঞ্চমী তিথিতে, উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া অঞ্চলে শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়িতে।

শ্রীম শৈশব থেকেই সুদর্শন, সুশীল ও শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। এবং তখন থেকেই তাঁর মেধা, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও কবিপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যেত। পরিণত বয়সে একদিন তাঁর কাছে সমবেত প্রিয় ভক্তমণ্ডলীকে তিনি বলেছিলেন, যখন তাঁর বয়স মাত্র দেড় বছর, তখন একদিন তাঁদের বাড়ির ওপর তলার রান্নাঘরের জানালা দিয়ে পশ্চিম আকাশে দিনান্তের সূর্যকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।[১]

চার—পাঁচ বছর বয়সে শ্রীম তাঁর মায়ের সঙ্গে শ্রীরামপুরের মাহেশে রথযাত্রা দেখে ফেরার পথে দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে আসেন। সেখানে মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণে যখন তিনি হঠাৎ আত্মীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কান্নাকাটি শুরু করেন, তখন একজন সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর কান্না থামিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি বলতেন, সেদিন যিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, তিনি হয়তো স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই হবেন।

অতি শৈশবেই শ্রীম লেখাপড়া শুরু করেন। প্রথমে পাঠশালায়, বাড়ির কাছেই 'সাধারণ ব্রাহ্ম—সমাজ'—এর অনতিদূরে। তখন তিনি নেহাৎ শিশু বলে কোনও কোনও দিন পাঠান্তে গুরুমশাই তাঁকে কোলে করে বাড়িতে পৌঁছে দিতেন।

পাঠশালার পাঠ শেষ হলে শ্রীম ভর্তি হলেন তখনকার বিখ্যাত হেয়ার স্কুলে। এখানেই অষ্টম শ্রেণীতে (তখনকার থার্ড ক্লাসে) পড়ার সময় (১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ) তিনি ডায়েরি লেখা শুরু করেন নিজেরই খেয়ালে। এরপর থেকে বরাবর তাঁর ডায়েরি লেখার অভ্যাসটা ছিল। ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পরও তিনি ডায়েরি লিখতেন।

হেয়ার স্কুল থেকে শ্রীম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি ফার্স্ট আর্টস (এফ. এ.) পড়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে গণিতের একটা পত্র পরীক্ষা না দিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই তিনি এরপর বি. এ. পরীক্ষা দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তৃতীয় হন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ই পরবর্তী কালের বিখ্যাত বাগ্মী ও স্বদেশপ্রেমিক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও হৃদ্যতা হয়। সেইসময় কোনও এক সভার প্রেসিডেন্ট ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, আর সেক্রেটারি ছিলেন শ্রীম। বি. এ. পড়ার সময়েই ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীম কেশবচন্দ্র সেনের জ্ঞাতি ঠাকুরচরণ সেনের কন্যা নিকুঞ্জদেবীকে বিয়ে করেন। ইনি ছিলেন সম্পর্কে কেশব সেনের বোন।

বি. এ. পাশ করার পর শ্রীম আইন পড়তে শুরু করেন। এইসময় তিনি পাঠ্য বই ছাড়াও মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, বৃহস্পতিসংহিতা ইত্যাদি অধ্যয়ন করতেন। এর আগেই পাশ্চাত্যদর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত কাব্য, পুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। কবি কালিদাসের রচনাকে তিনি অতি উচ্চ স্থান দিতেন। কালিদাস রচিত ঋষিদের তপোবনের বিবরণ তাঁর কণ্ঠস্থ থাকত। এছাড়া ষড়দর্শন, জৈন ও বৌদ্ধদর্শন, জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদও তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন।

শ্রীম'র ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আই. সি. এস. পড়ার বাসনা ছিল। সেসময় বি. এ.—তে ভালো ফল করতে পারলে স্টেট স্কলারশিপ পাওয়া যেত। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ইংল্যাণ্ড থেকে আই. সি. এস. হয়ে ফিরলে পূর্ব—পরিচয়ের সূত্রে শ্রীম তাঁর কাছে গিয়ে আই. সি. এস. হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। সেইসময় তাঁর কবিমন কল্পনার চোখে দেখত, ভূমধ্যসাগরের ঘন কুয়াশার মধ্যে তাঁর জাহাজ চলছে আর তিনি জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখছেন। কিন্তু পারিবারিক কারণে শ্রীম'র যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে বাসনা পূর্ণ হয়নি। অধ্যয়ন শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে চাকরি করা শুরু করতে হয়।

শ্রীম'র চাকরিজীবন শুরু হয় এক ব্রিটিশ সওদাগরি অফিসে। এখানে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। প্রথমে কিছুদিন যশোহর জেলার নড়াইল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ ক'রে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। এখানে সিটি ও রিপন কলেজিয়েট স্কুল,বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন মূল ও শাখা স্কুল, এরিয়ান, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, মডেল প্রভৃতি নানা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। অনেক সময় একই দিনে এক ঘণ্টা করে তিনটি স্কুলেও তিনি প্রধান শিক্ষকের কাজ করতেন। তাছাড়া সিটি ও রিপন কলেজে তিনি ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাপনাও করতেন।

জীবনের শেষ পর্বে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি ন'কড়ি ঘোষের ছেলের কাছ থেকে ঝামাপুকুরের মর্টন ইনস্টিটিউশনটি কিনে নেন। কিছুদিন পরে এই স্কুল ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। স্কুলটির এত সুনাম হয় যে, সেখানে বহু ছাত্র পড়তে আসে। একটি বাড়িতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় দুটি বাড়ির প্রয়োজন হয়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্রীম এই স্কুলের সত্ত্বাধিকারী (মালিক) ও অধ্যক্ষ (রেক্টর পদীবযুক্ত) ছিলেন। শ্রীম'র জীবৎকালেই অবশ্য পরে অন্য দুটি বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়। কেবল ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতেই স্কুলটি থাকে।

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে চাকরি—জীবনের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই শ্রীম'র মা স্বর্গগতা হলেন। তারপর থেকেই সংসারে অশান্তি শুরু হল। শ্রীম'র কর্মজীবনের প্রায় দশবছর পরে তাঁদের একান্নবর্তী পরিবারের এমন অবস্থা ঘটল যে শান্ত ও স্থিতধী শ্রীম পারিবারিক কলহে বিরক্ত হয়ে পৃথিবী থেকেই চিরবিদায় নেওয়ার কথা বিশেষভাবে ভাবতে লাগলেন। এইরকম সময়ে একদিন অবস্থা চরমে উঠল। সেদিন শনিবার। শ্রীম রাত দশটার সময় গৃহত্যাগ করলেন আত্মহত্যার সংকল্প নিয়ে। তাঁর স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী তাঁর ভয়াবহ সংকল্পের কথা অনুমান করে, একা না ছেড়ে তাঁর সঙ্গিনী হলেন, বাড়ির সকলের অগোচরে। অগত্যা শ্রীম সস্ত্রীক অনির্দিষ্টের উদ্দেশে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লেন। শ্যামবাজারে পৌঁছালে গাড়ির একটা চাকা হঠাৎ ভেঙে গেল। অসহায় শ্রীম কী করেন? কাছেই এক বন্ধুর বাড়ি ছিল। ভাবলেন, রাত্রের মতো সেখানেই আশ্রয় নেবেন। বন্ধুর বাড়িতে অত রাত্রে এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলেন, অসময়ে তাঁর ওখানে আসায় বন্ধু অখুশি। অগত্যা সাময়িকভাবে তাঁর স্ত্রীকে ওখানে রেখে শ্রীম আবার বেরোলেন একটা গাড়ির সন্ধানে। কাছেই এক আস্তাবলে গিয়ে ঘুমন্ত গাড়োয়ানকে ডেকে তুলে তাকে বেশি অর্থ দিয়ে গাড়ি নিয়ে এলেন বন্ধুর বাড়ি। সেখান থেকে নিঃশব্দে স্ত্রীকে তুলে নিয়ে বন্ধুর অগোচরে প্রায় রাত বারোটার সময় রওনা দিলেন বরাহনগরের দিকে। সেখানে থাকেন তাঁর বড় দিদি, ঈশান কবিরাজের স্ত্রী। কবিরাজ ঈশানচন্দ্র মজুমদার প্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসা করতেন। গভীর রাতে দিদির বাড়ি পৌঁছালেন শ্রীম।

পরদিন রবিবার। শ্রীম'র মন নিরাশায় পূর্ণ, বিষণ্ণ। এই অবস্থায় সারাদিন গত হলে, বিকেলে বরাহনগরের সিদ্ধেশ্বর মজুমদার তাঁকে নিয়ে একটু ঘুরতে বের হলেন। শ্রীম বিষণ্ণচিত্তে যন্ত্রচালিতের মতো সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে বরাহনগরের এ বাগান, সে বাগান ঘুরতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়ির কাছে পৌঁছে সিদ্ধেশ্বর শ্রীমকে বললেন, "গঙ্গার ধারে একটা চমৎকার বাগান আছে। সে বাগানটা কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।"

গঙ্গাতীরে সুষমামণ্ডিত চমৎকার বাগানটি শ্রীম'র মন হরণ করল। তিনি স্বভাবত কবিত্বপ্রিয়। এই বাগানের সবকিছুই যেন কাব্যশ্রীমণ্ডিত। শ্রীম ফুল দেখছেন, তার আঘ্রাণ নিচ্ছেন আর ভাবছেন, আহা! কী সুন্দর ফুল!

ধীরে ধীরে শ্রীম'র বিষণ্ণতা কেটে যাচ্ছে। বিগত রাত্রের তীব্র আত্মহননের ইচ্ছা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। এদিকে দেখতে দেখতে চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। এই সন্ধিক্ষণে, এই মাহেন্দ্রক্ষণে শ্রীম সিদ্ধেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বাইরে দক্ষিণপূর্ব বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বসে, পূর্বাস্য। মেঝেতে ভক্তেরা বসে। ঘর পরিপূর্ণ। শ্রীম শুনলেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "যখন একবার হরি, বা একবার রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না।" শ্রীম যেন দৈববাণী শুনলেন। কানে মধু বর্ষিত হল।

এই প্রথম দর্শনেই তিনি মন্ত্রমুগ্ধ। ইতিমধ্যে ঠাকুরবাড়িতে মা ভবতারিণী, রাধাকান্ত এবং দ্বাদশ শিবমন্দিরে দেবতাদের আরতি শুরু হয়েছে। আরতির পর শ্রীম আবার শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ফিরে এলেন। প্রাথমিক পরিচয় হল। ঘরে ফেরার সময় তিনি হাতজোড় করে প্রণাম করলে, ঠাকুর বললেন, "আবার এসো।" ফিরে আসতে আসতে শ্রীম'র মনে হল—এ সৌম্য কে, যাঁর কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে? ইনিও বললেন, আবার এসো। কাল কি পরশু সকালে আবার আসব।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীম'র প্রথম দর্শন। এরপর থেকেই তাঁর কাছে ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীম বুঝলেন, তিনি মনের মানুষের, একান্ত আপনজনের সন্ধান পেয়েছেন। এবং প্রথম পরিচয়ের দিন—সাতেকের মধ্যেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। তাই একদিন মন্দির—প্রাঙ্গণে ঠাকুরের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সাহস করে শ্রীম বললেন, ''ছলনার লীলাভূমি এই সংসার থেকে বিদায় নেওয়াই তো ভালো।'' শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই সস্নেহে উত্তর দিলেন, ''বালাই, কেন যাবে তুমি সংসার থেকে বিদায় নিতে? তোমার যে গুরুলাভ হয়েছে।'' যা অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, স্বপ্নের অগোচর এমন সমস্যাও গুরুকৃপায় নিমেষে দূর হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভয় বাণীতে শ্রীম'র ভরসা হল, মন মেঘমুক্ত হয়ে গেল, আবার বেঁচে থাকার ইচ্ছা ফিরে এল।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ আগস্ট—এই চার বছরের কিছু বেশি সময় শ্রীম ঠাকুরের সংসর্গ লাভ করেন। তাঁর মধ্যে ধর্মচেতনা লাভের তৃষ্ণা আজন্মই ছিল। প্রথম জীবনে 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ'—এর প্রতিষ্ঠাতা উদারচেতা কেশবচন্দ্র সেনই ছিলেন তার আদর্শ মানুষ। ছাত্রজীবনে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে থাকতেন। কখনও কখনও দু—তিন ঘণ্টা আগে গিয়ে বক্তৃতা—স্থলে অপেক্ষা করতেন। ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষায় এবং খ্রীষ্টীয় প্রচারকদের প্রভাবে শ্রীম প্রথম জীবনে নিরাকার উপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন এবং সাকার উপাসনাকে পৌত্তলিকতা বলে মনে করতেন, এবং তাকে হীন দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু ঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গ করার ফলে আধ্যাত্মিক বিষয়ে শ্রীম'র দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে গেল। শ্রীম পরে বলেছেন, ''যখন কেশব সেনের বক্তৃতা শুনতাম তখন মনে হত ঈশ্বর অনেক দূরে। কিন্তু ঠাকুরের কাছে যেতেই দেখলাম ঈশ্বর খুব কাছে।''

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের দুর্গাপূজা (১৯, ২০, ২১ ও ২২ অক্টোবর) উপলক্ষে কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে প্রতিদিন সকালে উপাসনা হয়। তাই শুনতে শ্রীম সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিনদিনই ওখানে যান। সেখানে কেশবচন্দ্র দুর্গাপূজার ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলেছিলেন, ''যদি মাকে পাওয়া যায়, যদি মা দুর্গাকে কেউ হৃদয়—মন্দিরে আনতে পারে, তাহলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ আপনি আসেন। লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য, সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, কার্ত্তিক অর্থাৎ বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ সিদ্ধি—এসব আপনি হয়ে যায়, মা যদি আসেন।'' ঠাকুর শ্রীম'র মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে বলছেন, ''তুমি এখানে—ওখানে যেওনা—এখানেই আসবে। যারা অন্তরঙ্গ তারা কেবল এখানেই আসবে। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল—এরা আমার অন্তরঙ্গ। এরা সামান্য নয়।''[২]

ঠাকুর প্রথম সুযোগেই শ্রীমকে জানিয়ে দিলেন যে, শ্রীম তাঁর অন্তরঙ্গ, কাজেই তিনি সামান্য নন। ২৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমকে ঠাকুর বললেন, ''মা আগে থাকতে সব দেখিয়ে দেয়। বটতলায় (পঞ্চবটীতলায়) গৌরাঙ্গের সংকীর্তনের দল দেখেছিলাম (সাদা চোখে)। তার ভিতর যেন ... তোমায় দেখেছিলাম। ...

''তোমায় চিনেছি—তোমার চৈতন্যভাগবত পড়া শুনে। তুমি আপনার জন—এক সত্তা—যেমন পিতা আর পুত্র। ...

''যতদিন এখানে আস নাই, ততদিন ভুলে ছিলে, এখন আপনাকে চিনতে পারবে। ...''[৩]

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের দিনই ঠাকুর শ্রীমকে বলেছিলেন, ''সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা—সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়।

''বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মতো মানুষ করে। বলে, 'আমার রাম, আমার হরি', কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।''[৪]

ঠাকুর শ্রীমকে সংসারে রাখবেন বলে প্রথমেই সংসারে কেমন করে থাকতে হবে, তা শিখিয়ে দিলেন। ঠাকুর বলতেন, ''সংসার যেন জ্বলন্ত আগুন। সেখানে ঢুকলে লোকে ঝলসাপোড়া হয়ে যায়।'' শ্রীমকেই তিনি একথা বহুবার বলেছেন। তবুও তিনি শ্রীমকে, যিনি এই সংসার জ্বালাতেই জর্জরিত হয়ে আত্মহননের সংকল্প করেছিলেন, তাঁকে সংসারে কেন রাখলেন? 'গুপ্তযোগী' হয়ে সংসারে তিনি রইলেন লোকশিক্ষার জন্য। সহস্র সহস্র মানুষের কাছে তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণকে পৌঁছে দিলেন 'কথামৃতে'র মাধ্যমে।[৫]

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ মার্চ, বেলা আন্দাজ তিনটে। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে বসে ভক্তদের সঙ্গে রঙ্গ—রসিকতা করতে করতে হঠাৎ ছোট নরেনকে একদৃষ্টে দেখতে দেখতে সমাধিস্থ হলেন। কিছুক্ষণ পরে সমাধি—ভঙ্গ হল; কিন্তু তখনও ভাবস্থ। এই অবস্থায় প্রত্যেক ভক্তকে সম্বোধন করে কার কী হবে, কার কী অবস্থা, কিছু কিছু বললেন। শ্রীমকে বললেন, ''তুমি তো আছই! একটু বাকি আছে, সেটুকু গেলে কর্মকাজ, সংসার কিছু থাকে না। সব যাওয়া কি ভালো?''

একটু পরে ঠাকুর শ্রীমকে আবার বলছেন, ''ভাগবত পণ্ডিতকে একটি পাশ দিয়ে ঈশ্বর সংসারে রেখে দেন, তা না হলে ভাগবত কে শোনাবে। রেখে দেন লোকশিক্ষার জন্য। মা সেইজন্য (তোমাকে) সংসারে রেখেছেন।''

সংসার যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রিত হওয়ার আগেই শ্রীম তা বুঝেছিলেন। তাই ঠাকুরের এই কথায় তিনি শংকিত বোধ করলেন। তাঁর অন্তরের বাসনা ছিল, তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হবেন। তিনি দেখছেন, ঠাকুরের অন্য অন্তরঙ্গ ভক্ত—রাখাল, যোগেন এবং তারক—এঁরা দারপরিগ্রহ করলেও ঠাকুর এঁদের সন্ন্যাস—আশ্রমী করবেন। বলতে গেলে তাঁর অবস্থাও তো এঁদেরই মতন; তবে তিনি কেন অনুমতি পাবেন না? তাই তিনি ঠাকুরের কাছে সন্ন্যাস নেওয়ার বাসনা নিবেদন করলেন। ঠাকুর তাঁকে বললেন, ''মা আমাকে বলেছেন, তোমাকে তাঁর একটু কাজ করতে হবে—লোককে ভাগবত শোনাতে হবে। মা ভাগবতের পণ্ডিতকে একটা পাশ দিয়ে সংসারে রেখে দেন।''

ঠাকুর আরও বললেন, ''তুমি প্রথম আসতে মাত্র তোমায় তো আমি বলেছিলাম, তোমার ঘর। আমি তো সব জানি?''

শ্রীম তা স্বীকার করলেন।

ঠাকুর আবার বললেন, ''তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কী হবে, এসব তো আমি জানি?'' শ্রীম করজোড়ে তা—ও স্বীকার করলেন।[৬] তবুও সন্ন্যাসের জন্য পীড়াপীড়ি করলে একদিন সন্ধ্যার পর সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে ঠাকুর বললেন, ''কেউ যেন মনে না করে, আমি না হলে মায়ের কাজ চলবে না। মা একটা তৃণ থেকে বড় বড় আচার্য তৈরি করতে পারেন।''[৭]

শেষবার ঠাকুর রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরের পশ্চিম দিকের গোল বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে শ্রীমকে বললেন, ''একটা পাইপ নষ্ট হলে এঞ্জিনীয়ার আর একটা পাইপ লাগিয়ে দেয়। তার কাজ বন্ধ থাকে না।''

ঠাকুর শ্রীমকে বৈদান্তিক সন্ন্যাস না দিলেও নব ভাগবতকথা শোনানোর জন্য তাঁকে তান্ত্রিক সন্ন্যাস দান করলেন। শ্রীম বলেছেন, ঠাকুর তাঁকে ও বাবুরাম মহারাজকে একই দিনে পূর্ণাভিষিক্ত করেন।[৮] শ্রীম শ্রীগুরুর স্নেহ—শাসনে মন স্থির করলেন যে, গৃহস্থাশ্রমেই থাকবেন ঠাকুরের আদেশে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীম একদিন ঠাকুরকে বলেন, ''সন্ন্যাসজীবনই শ্রেষ্ঠ। যাঁরা অন্তঃসন্ন্যাস ও বহিঃসন্ন্যাস করতে পারেন, তাঁরাই মহা ভাগ্যবান।''

এর উত্তরে ঠাকুর তাঁকে বলেন, ''মনে ত্যাগ হলেই হল, অন্তঃসন্ন্যাসই সন্ন্যাস। সংসার কারাগার থেকে মুক্ত হলেই হল। কেরানী জেলে গেলে জেল থেকে বেরিয়ে কি ধেই ধেই করে নাচবে? গুপ্ত ও ব্যক্ত দু—রকম যোগী আছে; গুপ্তযোগী সংসারে থাকতে পারে।''

এরপর একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর নিজের ডান হাতের কড়ে আঙুল নিজের জিভে ঠেকিয়ে শ্রীম'র জিভে কিছু লিখে দিলেন। তাতে শ্রীম'র বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। ইষ্টদর্শন করে পরমানন্দে শ্রীম দীর্ঘসময় সমাধিস্থ হয়ে থাকেন।[৯]

শ্রীম সংসারে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাগবত শোনাবেন, তাই ঠাকুর তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষাদান শুরু কলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রায় এক মাস, ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত শ্রীমকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে নিজের কাছে রেখে তাঁকে যথাবিধি সাধনপ্রণালী শেখাতে লাগলেন। কীভাবে সাকারে মন স্থির করতে হয় এবং কীভাবে নিরাকারের উপাসনা করতে হয়, কীভাবে দাসীর মতো সংসারে থেকে ঈশ্বরে মনপ্রাণ অর্পণ করা যায়, কীভাবে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়, সে সমস্তই ঠাকুর একে একে শ্রীমকে হৃদয়ঙ্গম করিয়েছিলেন। সাধনার অনেক গুহ্যকথাই তাঁর কাছে ঠাকুর প্রকাশ করেন।

একদিন ঠাকুর শ্রীমকে কালীবাড়ির গভীর জঙ্গলে তাঁর তন্ত্রসাধনার স্থান, বেলগাছের তলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে ধ্যান করতে বললেন। প্রায় তিন ঘণ্টা অতীত হলেও তিনি ফিরছেন না দেখে ঠাকুর স্বয়ং সেখানে হাজির হলেন। শ্রীম তখন দক্ষিণপূর্বমুখ হয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। ঠাকুর বেদির কাছে এসে দাঁড়াতেই তাঁর সন্নিধ্য—প্রভাবে শ্রীম'র ধ্যানভঙ্গ হল। চোখ মেলে তাকাতেই তিনি দেখলেন, হৃদয়ে যাঁকে ধ্যান করছিলেন তিনিই সামনে দাঁড়িয়ে। শ্রীম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আনন্দে ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলেন।

ঠাকুর শ্রীম'র জীবনপাত্র পূর্ণ করেছিলেন শুধু শ্রীম'র নিজের জন্য নয়, জগতের মঙ্গলের জন্য, জগতে তাঁর কালোপযোগী বাণী প্রচারের জন্য। ঠাকুর সাক্ষাতে বা সরাসরি তাকে যেসব উপদেশ দিতেন, শ্রীম তা ঠিক ঠিক বুঝেছেন কিনা, তা ঠাকুর নিজে পরীক্ষা করে নিতেন। বলতেন, "বল তো কী বললুম।" শ্রীম ঠাকুরের বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করলে কোথাও কোনও ত্রুটি থাকলে ঠাকুর তা সংশোধন করে দিতেন। শ্রীম নিজেও কখনও কখনও উপযাচক হয়ে নিজের সংশয় দূর করার জন্য প্রশ্ন করতেন। যেমন ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ৩ আগস্ট দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে :

শ্রীম—আজ্ঞা, শাস্ত্রে দু'রকম বলেছে। এক পুরাণের মতে কৃষ্ণকে চিদাত্মা, রাধাকে চিৎশক্তি বলেছে। আর এক পুরাণে কৃষ্ণই কালী—আদ্যাশক্তি বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেবী পুরাণের মত—এ—মতে কালীই কৃষ্ণ হয়েছেন। তা হলেই বা! তিনি অনন্ত, পথও অনন্ত।

শ্রীম এই কথা শুনে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বলছেন,

"ও বুঝেছি। আপনি যেমন বলেন, ছাদে ওঠা নিয়ে কথা। যে—কোনও উপায়ে উঠতে পারলেই হল—দড়ি, বাঁশ—যে—কোনও উপায়ে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—এইটি যে বুঝেছ, এটুকু ঈশ্বরের দয়া, ঈশ্বরের কৃপা না হলে সংশয় আর যায় না।[১০]

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় শ্রীম'র তীব্র বৈরাগ্য উদ্দীপিত হয়েছে। তিনি বলছেন, "এখন এরূপ ইচ্ছা হয় যে, কর্ম খুব কমে যায়, আর ঈশ্বরের দিকে খুব মন দিই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা! তা বৈ কি!

কিছুক্ষণ পরে শ্রীমকে ঠাকুর প্রশ্ন করছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—বৈরাগ্য মানে কী বল দেখি?

শ্রীম—বৈরাগ্য মানে শুধু সংসারে বিরাগ নয়। ঈশ্বরে অনুরাগ আর সংসারে বিরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

"সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু উগুনোর জন্য অত ভেবো না। যদৃচ্ছালাভ—এই ভালো। সঞ্চয়ের জন্য অত ভেবো না। যারা তাঁকে মন প্রাণ সমর্পণ করে—যারা তাঁর ভক্ত, শরণাগত,—তারা ওসব অত ভাবে না। যত্র আয়—তত্র ব্যয়। একদিক থেকে টাকা আসে, আর একদিক থেকে খরচ হয়ে যায়। এর নাম যদৃচ্ছালাভ। গীতায় আছে।"[১১]

শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত পার্ষদ। শ্রীম'র জন্মের সমসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম কলকাতায় এসে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি অঞ্চলে রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে পূজকের কাজ করতেন। শ্রীম'র সঙ্গে পরিচয়ের পর ঠাকুর কখনও কখনও তাঁকে বলতেন, "ওই সময় আমি তোমাদের পাড়ায় থাকতাম।"

শ্রীম অবাক হয়ে ভেবেছেন, "... কী আশ্চর্য! তিনি কি জন্ম থেকেই খবর রেখেছেন? চার বছর বয়সে তিনিই হয়তো আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর সামনে। আমি কাঁদছিলাম। মা মাহেশের রথের ফেরৎ ওখানে নেমেছিলেন। এদিক, সেদিক সব দর্শন করছিলেন, আমি একা পড়ে গিছলাম। ঠিক মনে পড়ছে, একজন যুবক এসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আর একবার আমি ছাদে বসে বৃষ্টিতে ভিজছিলাম আর কাঁদছিলাম। তখন আশ্বিনের সেই বিধ্বংসী ঝড় হচ্ছিল। এই কথা স্মরণ করে পরে একদিন (ঠাকুর) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার ওই আশ্বিনের ঝড়ের কথা মনে আছে?"[১২]

'কথামৃত'—তেও পাই অনুরূপ বর্ণনা, "মাস্টার (শ্রীম) বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, ঠাকুর হঠাৎ আশ্বিনের ঝড়ের দিনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? আমি যে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে একাকী এক ঘরে বসে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেছিলাম, ঠাকুর কি সব জানেন ও আমাকে মনে করাইয়া দিতেছেন? উনি কি জন্মাবধি আমাকে গুরুরূপে রক্ষা করিতেছেন?"[১৩]

শ্রী নিজেই এ—প্রশ্নের সমাধান করে অন্যত্র বলছেন, "আর কিই বা আশ্চর্য—জন্ম থেকে সব খবর রাখা? যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের খবর রাখেন, তাঁর পক্ষে আশ্চর্য কি ভক্তদের খবর রাখা। মানুষভাবে দৃষ্টি করলেই আশ্চর্য বলে মনে হয়।"[১৪]

একদিন পারিবারিক কোনও কথা বলতে গিয়ে শ্রীম হঠাৎ বলে ফেলেন, "আমার ছেলে।" ঠাকুর তখনই তাঁকে সাবধান করে সস্নেহে বলেন, " 'আমার পুত্র' বলতে নেই। মনে করতে হয় ভগবানের পুত্র। আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন সেবার জন্য। কেন? যদি কিছু হয়, যদি তার শরীর ঈশ্বর নিয়ে নেন, তখন মহা বিপদে পড়বে। শোকে অধীর হয়ে পড়বে!"[১৫]

ঠাকুরের এই সাবধান বাণী উচ্চচারিত হওয়ার কিছুকাল পরেই শ্রীম'র জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে মাত্র আট বছর বয়সে দেহত্যাগ করে। তার শোকে পিতামাতা দুজনেই অধীর হলেও শ্রীম সেই শোক কিছুদিনের মধ্যেই সামলে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী সারাজীবন সেই শোক বহন করেছিলেন। কখনও কখনও শোকের তাড়নায় তিনি উন্মাদের মতো আচরণ করতেন। শ্রীম'র জীবনের এইসব বিপদ—আপদ এবং বিপর্যয় দেখিয়ে ঠাকুর নরেন্দ্র ও অন্যান্য ত্যাগিসন্তানদের বলতেন, "(মাস্টারের) এসব (বিপদ) তোদের শিক্ষার জন্য।"[১৬]

ঠাকুরকে দেখার পর এবং তাঁর কথা শোনার পর শ্রীম বুঝতে পারলেন কেশব সেনের বক্তৃতা তাঁর কেন এত ভালো লাগত। কেশব সেন বক্তৃতায় ঠাকুরের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবকে নিজের মতো করে বলতেন। আজ সেই অমৃতকথার সাক্ষাৎ স্পর্শসুখে শ্রীম'র বিলেতে গিয়ে আই. সি. এস. হওয়ার বাসনা আর রইল না। তিনি অর্থ রোজগারের উপায় দেখতে লাগলেন।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীম যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তখন তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন, (শ্যামবাজার শাখা)—এর প্রধান শিক্ষক। শ্রীরামকৃষ্ণের বহু অন্তরঙ্গ ভক্ত, যেমন শ্রীযুক্ত রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), সুবোধ (স্বামী সুবোধানন্দ), পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, বিনোদ, বঙ্কিম

(জনৈক ছাত্র), তেজচন্দ্র, পল্টু, ক্ষীরোদ, নারায়ণ প্রভৃতি সেইসময় ওই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই ছাত্রেরা তাঁকে 'মাস্টারমশাই' বলে ডাকতেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীগণ অনেকেই তাঁকে 'মাস্টারমশাই' বা 'মাস্টার' সম্বোধন করতেন। ঠাকুরও তাঁকে 'মাস্টার' বলে কখনও কখনও ডাকতেন। আবার অন্য সময় 'মহেন্দ্র' বা 'মহিন্দর' বলেও ডাকতেন। ঠাকুরের শ্রীমুখ—উক্ত এই 'মাস্টার' ডাকটিই শ্রীম'র সঙ্গে চিরতরে গ্রথিত হয়ে গেছে। 'কথামৃত'—র 'মাস্টার' চিরকালেরই মাস্টারমশাই। আজও তাঁরই হাত ধরে অগণিত সংসারতাপদগ্ধ মানুষ অবগাহন করছে শ্রীরামকৃষ্ণ—কথার অমৃত—উৎসে। আর অবাক বিস্ময়ে পান করছে সর্বতাপহর 'কথামৃত'।

শ্রীম ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিক পর্যন্ত মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে কর্মরত ছিলেন। শেষের দিকে ঠাকুরের অসুখের জন্য তাঁকে প্রায়ই কাশীপুর উদ্যানবাটী যেতে হত। এর ফলে সেই বছর (১৮৮৫—১৮৮৬) তাঁর স্কুলের পরীক্ষার ফল অন্যান্য বছরের মতো ততো ভালো না হওয়ায় সে—কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধারণভাবে উল্লেখ করে বলেন, "এবার কাশীপুরে মাস্টারের একটু যাতায়াত হয়েছে। তাই দেখছি ফল অন্যান্য বছরের মতো হয়নি।"

শ্রীম কবি—প্রকৃতির মানুষ; তাঁর মন স্বভাবত স্পর্শকাতর এবং অভিমানী। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় ঠাকুরের প্রতি কটাক্ষ থাকায় তাঁর প্রাণে তা বিষম বাজল। তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সস্নেহে তাঁকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু শ্রীম সবিনয়ে তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। সারা শহরে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল। ঠাকুরের কানেও পৌঁছাল এই সংবাদ। শ্রীম'র মুখে সব শুনে ঠাকুর বললেন, "বেশ করেছ, মা চালিয়ে দেবেন।"

কিন্তু অভিমানে, ঝোঁকের বশে চাকরি ছেড়ে দিলেও পক্ষকাল যেতে না যেতেই অর্থাভাব চরমে উঠল। শ্রীম যখন একেবারে দিশেহারা, সেই সময় একদিন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী গাড়ি পাঠিয়ে পত্রবাহক মারফৎ শ্রীমকে জানালেন, "আমি শুনেছি, আপনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। আমি রিপন কলেজ করেছি তা আপনি জানেন। আপনি যদি এই গাড়িতেই চলে আসেন তবে খুব খুশি হব। এখানে আপনার খুব দরকার অধ্যাপনার জন্য।"

পরবর্তী পাঁচ বছর শ্রীম রিপন কলেজেই অধ্যাপনা করেছিলেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে মর্টন ইনস্টিটিউশন কিনে স্বাধীন জীবিকা অর্জনের বন্দোবস্ত না করা পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে অধ্যাপনা করেন।

আগেই বলা হয়েছে—শ্রীম'র নিয়মিত ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। ঈশ্বরানুরাগ তাঁর স্বভাবগত ছিল বলে যখন যেখানে ভালো বক্তৃতা বা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনতেন, তা তখনই বিশেষভাবে লিখে রাখতেন। সেই অভ্যাসের ফলে ঠাকুরের সঙ্গে যেদিন যা কথাবার্তা হত, তা বার, তিথি, নক্ষত্র, তারিখ দিয়ে ডায়েরিতে লিখে রাখতেন।[১৭]

এ—প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে এক ভক্তকে শ্রীম বলেন, "আমি তাঁর কথামৃত স্মৃতিতে বহন করে আনতাম এবং বাড়িতে এসে ডায়েরিতে তার সংক্ষিপ্ত নোট লিখে রাখতাম। অনেক সময় একদিনের কথার নোট সাতদিন ধরে স্মৃতি থেকে বের করে লিখতাম।"

একদিন (২৩ এপ্রিল, ১৮৮৬) গিরিশচন্দ্র কীভাবে এই ডায়েরি লেখার কথা জানতে পেরে শ্রীমকে বলেন, "ওহে, তুমি ঠাকুরের বিষয় কী নাকি লিখেছ?

শ্রীম—কে বললে?

গিরিশচন্দ্র—আমি শুনেছি। আমায় দেবে?

শ্রীম—না, আমি নিজে না বুঝে কারুকে দেব না। ও আমি নিজের জন্য লিখেছি। অন্যের জন্য নয়।... আমার দেহ যাবার সময় পাবেন।[১৮]

শ্রীম যে ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এই ডায়েরি রাখছেন, একথা তখনও তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু একদিন তারকনাথকে (স্বামী শিবানন্দ) তাঁর কথার নোট নিতে দেখে ঠাকুর বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, ও কাজের জন্য অন্য লোক ঠিক করা আছে।

শ্রীমই যে সেই লোক তখনও ঠাকুর তা বলেননি। কিন্তু ভক্তদের সঙ্গে কথা বলার সময় শ্রীম দক্ষিণেশ্বরে আছেন কিন্তু তাঁর সামনে উপস্থিত নেই জানলে ঠাকুর তাঁকে ডেকে পাঠাতেন। কারণ 'কথামৃত' রচনার মতো মহান কাজটি জগদম্বার দ্বারা আগে থেকেই শ্রীম'র জন্য সুনির্দিষ্ট ছিল।[১৯]

শ্রীম নবযুগের ভাগবত রচনা করবেন বলে ঠাকুর জগন্মাতার কাছে তাঁর জন্য শক্তি প্রার্থনা করেন। মা শ্রীমকে এককলা শক্তি দিয়েছেন বলে ঠাকুরকে জানালে ঠাকুর বলেন, "ওকে এককলা শক্তি দিলি কেন; ও —বুঝেছি। ওতেই তোর কাজে হবে।"

ঠাকুর জগন্মাতার কাছে শ্রীম'র জন্য প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "এর সব ত্যাগ করিও না মা।... (একে) সংসারে যদি রাখিস, তো একেকবার দেখা দিস; না হলে কেমন করে থাকবে মা?... মা, এর চৈতন্য করো, তা না হলে অপরকে চৈতন্য কেমন করে করাবে?"

'শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাগবত' তথা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' রচনার উপযুক্ত আধাররূপে শ্রীমকে গড়ে তুলতে ঠাকুর প্রথম থেকেই সচেষ্ট। তাই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারেই ঠাকুর, শ্রীম'র 'আমি লেখাপড়া জানা মানুষ, তাই জ্ঞানী'—এই অহংকার সমূলে বিনাশ করলেন। তাঁকে সম্পূর্ণ নিরভিমান করলেন। তা না হলে শ্রীম সংসারে দাসীর মতো থাকবেন কী করে?

শ্রীম ঠাকুরের দুটি উদ্দেশ্য সাধনের আধার। তিনি আদর্শ গৃহীর উদাহরণস্থল হবেন, সংসারে থেকেও নির্লিপ্ত হয়ে, নিয়ত সাধনার ধারাটি অব্যাহত রাখবেন এবং ঠাকুরের বাণীর ধারক, বাহক ও প্রচারক হয়ে অন্যের চৈতন্য করাবেন।

শ্রীম'র সাধনা ও গার্হস্থ্য জীবন

অধ্যাত্মজীবন গঠনের সাধনা শ্রীম শুরু করেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে, ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে বাস ক'রে। সেখানে প্রায় একমাস একটানা বাস ক'রে সাধনার মূল বিষয়গুলি তিনি আয়ত্ত করেন।

শ্রীমকে সাধনার মূল যে—দুটি সূত্র শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছিলেন, তা হল নির্জনবাস এবং সাধুসঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাধনার প্রথম পাঠ অর্থাৎ বনিয়াদ তৈরি হয়ে গেলে, ঠাকুরের জীবৎকালে তিনি শিক্ষকতা করতে করতেই সাধনা শুরু করে দিলেন। মাঝে মাঝেই পরিবার—পরিজনদের একটি ভাড়াবাড়িতে রেখে তিনি নিজে কাছেই অন্যত্র একটি ঘরভাড়া করে সেখানে কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে জপধ্যান শুরু করে দিলেন।

শ্রীম তখন শ্যামপুকুর তেলিপাড়ায় এক ভাড়াবাড়িতে সপরিবারে বাস করছেন। সেইসময় ঠাকুর একদিন (২ অক্টোবর, ১৮৮৪) শ্রীমকে বললেন, "তোমার বাড়িটায় একবার যেতে হবে, তোমার আড্ডাটা জানা থাকলে, সেখানে আরও ভক্তদের সঙ্গে দেখা হবে।" এর কিছুদিন পরেই (২০ অক্টোবর, ১৮৮৪) ঠাকুর শ্রীম'র তেলিপাড়ার ভাড়াবাড়িতে শুভাগমন করেন।

ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগের পর থেকে শ্রীম শ্যামপুকুর অঞ্চলের বিভিন্ন ভাড়াবাড়িতেই সপরিবারে বাস করতেন। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীম'র প্রথম পুত্রের দেহত্যাগ হয়। সেই শোকে তাঁর স্ত্রী পাগলের মতো হয়ে গেলে, ঠাকুর তাঁকে (নিকুঞ্জদেবীকে) কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে থাকতে বলেন। শ্রীম কিন্তু এই শোক সামলাতে পেরেছিলেন। পরবর্তী কালে শ্রীম বলতেন, "শরণাগত ভক্ত হলে (ঠাকুর) মন টেনে রেখে দেন তাঁতে। তখন অল্প কষ্ট ভোগ হয় মনে। ... ঈশ্বরে মন থাকলে দুঃখকষ্ট কম হয়। কিন্তু দুঃখ হবেই।"[২০] "ছেলে সকলের অতি প্রিয়। সেই ছেলেকে নিয়ে যাওয়ায় বাপ—মার মন সাংসারিক বস্তু থেকে

আলাদা হয়ে যায়। তখন শান্তির জন্য সে মন ভগবানে দেব। এরূপ যাদের হয়, বুঝতে হবে, তারা উঁচু থাকের লোক।"[২১]

ঠাকুর একাধিকবার শ্রীমকে তাঁর পৈত্রিক বাড়িতে গিয়ে বাস করতে বলেন। তিনি বলতেন, একান্নবর্তী পরিবারে থাকলে ঈশ্বরভজনার কিঞ্চিৎ সুবিধে হয়; কারণ জীবনযাত্রা নির্বাহের ভার অনেকের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে হাতে অনেক সময় পাওয়া যায়। কিন্তু যে—তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে শ্রীমকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল, তারই স্মৃতি এতদিন তাঁর পৈত্রিক ভিটেতে ফিরে যাওয়ার বাধাস্বরূপ হয়েছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১৯ এপ্রিল, ১৮৮৫ তারিখে তিনি আবার তাঁর পিতৃগৃহে ফিরে বসবাস শুরু করলেন।

তীর্থভ্রমণকে শ্রীম সাধনার অঙ্গ বলে মনে করতেন। ঠাকুরের জীবৎকালেই শ্রীম একাধিকবার পুরীধামে জগন্নাথ দর্শনে যান। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনিই পুরীর জগন্নাথ। গুরুগতপ্রাণ শ্রীম তা—ই অভ্রান্ত বলে জেনেছিলেন, এবং গুরুবাক্য পালনই তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। একবার পুরী যাওয়ার আগে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে হয়।" বছরে দুবার সর্ব—সাধারণ জগন্নাথবিগ্রহ আলিঙ্গন করতে পারে। একবার স্নানযাত্রার সময়, আরেকবার রথের আগে। কিন্তু ঠাকুর যখন তাঁকে বলেছিলেন, তখন অসময়। এ—প্রসঙ্গে শ্রীম পরবর্তী কালে ভক্তদের বলেছিলেন, "(পুরীতে) আমি অসময়ে গেছি। (জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকে) ভাবছি কী করে (আলিঙ্গন) হয়। তখন তিনি এক বুদ্ধি দিলেন। দুই পকেটে করে টাকা, আধুলি, সিকি অনেক নিয়ে মন্দিরে ঢুকলাম। গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করেই অসীম সাহসে যো সো করে আলিঙ্গন করে ফেললাম অত উঁচু রত্নবেদীতে আরোহন করে। অমনি 'কন করোচি, কন করোচি' বলে পাণ্ডারা চিৎকার করতে লাগল। যেমন তীরবেগে বেদীতে উঠে আলিঙ্গন করলাম, তেমনি তীরবেগে নেমে প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম। আর দুহাত ভরে টাকাকড়ি ছুঁড়ে চারিদিকে ফেলতে লাগলাম। অন্ধকারে পাণ্ডারা ওই সব টাকাকড়ি কুড়োতে লাগল। আর আমি ওই ফাঁকে (গর্ভমন্দির থেকে) বের হয়ে গেলাম (হাস্য)। ওই একটি অতি দুঃসাহস কাজ হয়েছিল।"[২২]

একবার (১৯২০—২১ খ্রীস্টাব্দে) রথযাত্রার কয়েকদিন পরে মহাপ্রসাদের গুণকীর্তন ক'রে, শ্রীম এক ভক্ত (স্বামী ধর্মেশানন্দ)—কে বললেন, "এই মহাপ্রসাদ ধারণ করলে অন্তরে ভক্তিলাভ হয়।" ভক্তটি তখন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন; তাই তাঁর কথাতে প্রত্যয় না হওয়াতে শ্রীম তাঁকে বললেন, "একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর আমায় বললেন, 'রথযাত্রা হয়ে গেল, এইসময় শ্রীক্ষেত্র থেকে রথযাত্রীরা ফিরছে, তুমি স্টেশনে গিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে আমার জন্য মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করে নিয়ে এসো, আমি ওই প্রসাদ গ্রহণ করব। প্রসাদ ধারণ করলে অন্তরে ভক্তিলাভ হয়।' আমি হাওড়া স্টেশনে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের নামতে দেখে ভিক্ষুকের মতো হাত পেতে বলতে লাগলাম, 'একটু মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দেবেন?' ভদ্রবেশধারী আমাকে ওইরূপে ভিক্ষা করতে দেখে কেউ অবাক হয়ে চেয়ে রইল, কেউ বা দ্রুতবেগে চলে গেল, কোনও কোনও মহাজন আমার অন্তরের ভাব বুঝে আটকে খুলে সযত্নে বা অযত্নে আমায় একটু প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ নিয়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর কত খুশি! তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টম। আমি কৃতার্থ হলাম। ঠাকুর এর দুয়েকটা দানা রোজ খেতেন, আমাকেও রোজ সকালে খেতে বলেছিলেন। তাঁর কথা বিশ্বাস করো। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়'—আর অন্য উপায় নেই।"[২৩]

পরমভক্ত শ্রীম ঠাকুরের জীবৎকালেই ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি পত্নী নিকুঞ্জদেবী, বড় ছেলে নটী (প্রভাসচন্দ্র) ও ঝিকে সঙ্গে নিয়ে তারকেশ্বরে যান। সেখানে তারকেশ্বর শিবের চরণামৃত তিনি আঁজলা আঁজলা পান করেন। পরদিন ঠাকুর তাঁর এই বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে বলেন, "এতদিনে তোমার হাত শুদ্ধ, হাড় শুদ্ধ হল। ধন্য! ধন্য তুমি!"

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে শ্রীমই সর্বপ্রথম কামারপুকুর ধাম দর্শন করতে যাত্রা করেন ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬, ভোর পাঁচটায়। এ—প্রসঙ্গে অনেক পরে ভক্তদের তিনি বলেছেন, "সেইসময় চোখে কে যেন নূতন

অনুরাগের অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিল। সবই ঠাকুরের সঙ্গে জড়িত দেখতাম। যাকে দেখতাম, তাকেই প্রণাম করতাম। দূর থেকে কামারপুকুর দর্শন করেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি।"

সেইসময় সারা কামারপুকুরের যাবতীয় বৃক্ষ—লতা, জীবজন্তু, মানুষজন সব কিছুকেই তিনি জ্যোতির্ময় দেখেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবৎকালেই ১৮৮৬—এর ১৭ মে কয়েকদিনের জন্য তিনি দার্জিলিঙ—এ হিমালয় দর্শন করতে যান। সেখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনে ঈশ্বরের স্মরণ হওয়ায় ভাবাবেশে আপনা—আপনি তাঁর চোখে জল আসে। ফিরে এলে ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কেমন, হিমালয় দর্শন করে ঈশ্বরকে মনে পড়েছিল?"[২৪]

ঠাকুরের গলায় ক্যান্সার ধরা পড়লে তাঁর চিকিৎসার সুবিধের জন্য তাঁকে কলকাতায় আনা হয় ১৮৮৫—এর সেপ্টেম্বর মাসে। শ্যামপুকুর স্ট্রীটের একটি ভাড়াবাড়িতে তিনি কিছুদিন থাকেন। তারপর ডিসেম্বর নাগাদ তাঁকে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে স্থানান্তরিত করা হয়। ঠাকুরের শারীরিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হতে থাকে। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা এইসময় তাঁকে প্রাণপণ সেবা করতে থাকেন। এই সেবার সুবিধার্থে শ্রীম তখন কাশীপুরের কাছেই বাসাভাড়া করে থাকতে শুরু করেন। দিনে স্কুলের কাজ, রাত্রে ঠাকুরের সেবা, এইভাবে চলতে থাকে তাঁর দিন।

ঠাকুরের শরীর ক্রমেই খারাপ হতে থাকায় শ্রীম অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ তারিখে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেন, "তুমি আত্মহত্যা কর আর যাই কর, আমি আর সংসারে থাকব না। ... এখন আর বড় বাড়িতে (পৈত্রিক বাড়িতে) যাচ্ছি না।"

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মর্তধাম ছেড়ে অমৃতলোকে যাত্রা করলেন। তাঁর বিরহে তখন তাঁর সব অন্তরঙ্গ ভক্তই শোকাকুল, দিশাহারা। কর্ণধার—বিহীন নৌকার যাত্রীদের মতো তাঁদের অবস্থা। সবাই উদভ্রান্তের মতো দিন যাপন করছেন।

ঠাকুরের শরীর যাওয়ার সাতদিন পর থেকেই শ্রীম সপ্তাহে তিনদিন ক'রে দক্ষিণেশ্বরে বাস ক'রে কঠোর জপধ্যান, তপস্যা শুরু করলেন। আর চারদিন করে বৈষয়িক কাজকর্ম, জীবন—ধারণের জন্য যা আবশ্যিক, তা করতে লাগলেন।

কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুরের যেসব ভক্ত দিনরাত সেবা করতেন, তাঁদের কারও কারও ফিরে যাওয়ার মতো আশ্রয় ছিল না। ঠাকুরের শেষ সময়ের রসদদার এবং বিশিষ্ট ভক্ত সুরেন্দ্র (সুরেশচন্দ্র মিত্র—ঠাকুর, এঁকে সুরেন্দ্র বলে ডাকতেন) তাঁদের বললেন, "ভাই, তোমরা আর কোথায় যাবে, একটা বাসা করা যাক। তোমরাও থাকবে, আর আমাদেরও জুড়োনোর একটা স্থান চাই; তা না হলে সংসারে এরকম ক'রে রাতদিন কেমন ক'রে থাকব? সেইখানে তোমরা গিয়ে থাক। আমি কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিতাম। এখন তাতেই বাসা খরচ চলবে।"[২৫]

সুরেন্দ্রর প্রস্তাবমতো বরাহনগরে একটি প্রাচীন বড় বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল। এই বাড়িতেই ১২ অক্টোবর, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ, বরাহনগর মঠ—এর সূত্রপাত হল। (উদ্বোধন, চৈত্র, ১৪০৬)

শ্রীম বরাহনগর মঠে প্রথম আসেন ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭—তে। ১৫ মে, দুপুরবেলা তিনি স্বপ্ন দেখছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিমূর্তি। গায়ে হাত দিয়ে দেখছেন—বাহ্যসংজ্ঞা নেই; শ্রীম'র হঠাৎ বোধ হল—বিশ্বচরাচর মায়াময়, নির্গুণ চৈতন্যকে তাঁর সত্তার ভিতর বোধ করেন। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গের পর তাঁর চরণ দুটি আঁকড়ে ধরেন। ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় তাঁকে কৈবল্যদায়িনী মন্ত্র দান করেন।

ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পরপরই ৩০ আগস্ট, ১৮৮৬—তে শ্রীশ্রীমা কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে বৃন্দাবন যান। শ্রীম'র স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গী হন; কিন্তু মাসখানেক পরেই ম্যালেরিয়া হওয়ায় ফিরে আসেন।

শ্রীশ্রীমা ১৮৮৭—এর সেপ্টেম্বরে বৃন্দাবন থেকে ফিরে এক পক্ষকাল (১—১৫ সেপ্টেম্বর) কলকাতায় থাকেন।

এর মধ্যে শ্রীম'র গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের পৈত্রিক বাড়িতেও কয়েকদিন থাকেন। এইসময় শ্রীশ্রীমা শ্রীম'র তিনতলার ঠাকুরঘরে মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই একদিন শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থ হন।

১৮৮৭—র অক্টোবরে, পুজোর ছুটিতে শ্রীম বৃন্দাবন রওনা দেন। ঠাকুরের ভক্ত দ্বিজ ও তাঁর ভাইকে তিনি সঙ্গে নেন। এইসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বারোশো খাতা তাঁর দেখার কথা ছিল। কিন্তু ঠাকুরের অদর্শনে মন উচাটন থাকায় মাত্র তিনশো খাতা কোনও রকমে দেখে বাকি খাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেন, কাজটা অনুচিত জেনেও।

শ্রীম বৃন্দাবন থেকে যান কাশীধামে। সেখানে দর্শন করেন ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ ও স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে। ভাস্করানন্দ মহারাজদের সঙ্গে আলাপচারিতায় তাঁর কলকাতার ব্যস্ত জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যাত্ম—জীবনচর্যার সাধনা ও তপস্যার কথা উল্লেখ করলে ভাস্করানন্দজী বলেন, ''এই বলছ এত কাজ কর, তবে এসব ভাবার সময় পাও কী করে?''

কাশীতে শ্রীম স্বামী শান্তানন্দের সঙ্গে কাশীগিরির বাগানে কিছুদিন তপস্যা করলেন। কিন্তু তবুও অস্থির চিত্ত শান্ত না হওয়াতে তিনি এবার এলেন অযোধ্যায়। সেখানে শান্ত, আনন্দময়, স্বভাব, পরমহংস রঘুনাথদাস বাবাজীর দর্শন পেলেন। তিনিই প্রথম শ্রীম'র মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেছিলেন, ''কহাঁ ঘুমোগে? (অর্থাৎ কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে?) গুরুস্থান মে যাও, উনকা ধ্যান চিন্তা করো, গুণগান করো।'' এই মহাত্মার উপদেশে শ্রীম'র মন শান্ত হল। কয়েকমাস পরে তিনি ঘরে ফিরে এলেন।

তীর্থদর্শন ও তপস্যার প্রতি শ্রীম'র আজীবন প্রবল আকর্ষণ ছিল। পরবর্তী কালে তাঁর কাছে সমবেত অনুরাগীদের তিনি বলতেন, ''... তপস্যা চাই। তপস্যা মানে, তাঁকে হৃদয়ে বসানোর দৃঢ় সংকল্প প্রথমে চাই। তারপর মনে যারা বসে আছে—পুত্রকন্যা, বিত্তাদি তাদের ঈশ্বরভাবে মণ্ডিত করতে হয়—spiritualise করা। তাদের ঈশ্বরের রূপ বলে চিন্তা করা। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করা—হে ঈশ্বর, এদের ভিতর তোমাকে দেখার শক্তি দাও।''[২৬]

১৮৮৮—র ২৮ জানুয়ারি শ্রীম তাঁর পৈত্রিক বাড়িতে গুরুপূজা প্রবর্তন করেন এবং সেদিন কালীঘাটে মা কালীকে দর্শন করতে যান। এরপর ১৩ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরের জন্মতিথির দিন মঠ থেকে ঠাকুরের পাদুকা লাভ করেন এবং তাঁর বাড়িতে তা সযত্নে রাখার ব্যবস্থা করেন। এই বাড়ির ঠাকুরঘরেই নরেন্দ্রনাথ (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) ২৮ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরের পূজা করেন। এই বছর ৩০ অক্টোবর শ্রীম'র স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে মন্ত্রলাভ করেন।[২৭]

শ্রীম প্রায়ই কাজকর্ম সংসার ফেলে রেখে আবার কখনও বা স্ত্রীপুত্রকন্যাদের সঙ্গে নিয়েই তীর্থদর্শনে বেরিয়ে পড়তেন। এইভাবেই ১৮৮৯—এর ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীম সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে প্রথমে আঁটপুর এবং পরে কামারপুকুর যান।

১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দের সম্ভবত মে মাসে শ্রীম'র পিতৃবিয়োগ হল। আবার সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল। তখন শ্রীম পত্রে করুণাময়ী মায়ের কাছে আবেদন জানালেন—মা, শরণাগত করো, সব শক্তি তো তোমারই (১৯ মে, ১৮৮৯)। কদিন পরেই (২২ মে, ১৮৮৯) আবার লিখলেন, ''তুমি বিপদনাশিনী, তুমি রক্ষা করো।'' উত্তরে অভয় দিয়ে শ্রীশ্রীমা লিখলেন, ''সংসার জ্বলন্ত আগুন, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা হলে, কীনা হতে পারে?''

ঠাকুরের অবর্তমানে শ্রীশ্রীমা—ই ধীরে ধীরে শ্রীম'র জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে ওঠেন। গর্ভধারিণীর অভাব শ্রীশ্রীমা—ই দূর করেন। তাছাড়া, ঠাকুর যে জগজ্জননীর কাছে শ্রীমকে মাঝে মাঝে দর্শন দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, দেহধারিণী জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা—ই অকাতরে ঠাকুরের সেই প্রার্থনা পূরণ করেন। পুরী থেকে ফিরে কলকাতায় ১৮৮৯—এর ১২ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শ্রীম'র বাড়িতে শ্রীশ্রীমা অবস্থান

করেন। পরের বছর—শ্রীম তখন কম্বুলিটোলায় ২ নং হেম কর লেনে বাস করছেন, ৪ মার্চ, ১৮৯০ থেকে প্রায় একমাস সেখানে শ্রীশ্রীমা থেকেছেন। তার কদিন পরে আবার এসেছেন ৭ মে। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে শ্রীম'র পত্র মারফৎ নিয়মিত যোগ ছিল। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে শ্রীম একেবারে শিশুটির মতো হয়ে যেতেন। গর্ভধারিণীর মায়ের চেয়েও যেন বেশি ভালোবাসতেন তাঁকে। শ্রীমকে শ্রীশ্রীমা আদর করে 'বাবু' বলতেন।

১৮৮৯—এর ২৯ ডিসেম্বর শ্রীম—ই শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা পালন করেন। এই উপলক্ষে তিনি সারাদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে জপধ্যান করে কাটান।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীম'র বড় মেয়ে হাঁদুর মৃত্যু হল। এই মেয়েটিকে শ্রীম পাত্রস্থ করেছিলেন, কিন্তু তার বিয়ে সুখের হয়নি। সে বাপের বাড়িতেই থাকত। শ্রীশ্রীমা তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, তাই তার মৃত্যুতে শ্রীশ্রীমাও শোকার্ত হয়ে পড়েছিলেন।

অল্প সময়ের ব্যবধানে পিতৃবিয়োগ, কন্যাবিয়োগ, স্ত্রীর উন্মাদ অবস্থা সব মিলিয়ে সে সময় শ্রীম'র মানসিক অশান্তি চরমে। তখন শ্রীশ্রীমা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, ''ভগবানকে ডাকতে হলে মাথা ঠিক রাখতে হয়... আর তিনি (ঠাকুর) বলেছিলেন, যে আমার কাছে আসে সে কখনও পাগল হয় না; যাতে সবার শান্তি হয়, আমি সদাসর্বদা শ্রীশ্রীগুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করি।''

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে শ্রীম যখন সপরিবারে জয়রামবাটী যান, তখন সেখানেই একদিন ঠাকুরের ইঙ্গিতে শ্রীশ্রীমা শ্রীমকে মহামন্ত্র দান করেন। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের পর থেকে একসঙ্গে তিনটি স্কুলে শ্রীম হেডমাস্টারের কাজ আরম্ভ করেন। প্রতিটি স্কুলে একঘণ্টা করে পড়াতেন। যাতায়াত করতেন পাল্কিতে বা ট্রামে। একটি স্কুলের আয়ের টাকা দিতেন বরাহনগর মঠে, দ্বিতীয় স্কুলে আয়ের টাকা থেকে কিছু পাঠাতেন শ্রীশ্রীমাকে, আর বাকিটা ব্যয় করতেন ভক্তসেবার জন্য। তৃতীয় স্কুলের আয় থেকে নিজের পরিবারের ভরণপোষণ চালাতেন।[২৮]

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে শ্রীম বরাহনগর মঠে বাস করতে শুরু করেন। রাত্রে মঠে খেতেন, দিনে বাসায়। সকালে বেরোতেন, কাজকর্ম সেরে চারটের পর মঠে ফিরে তপস্যা করতেন। এই সময় শ্রীম গ্রে স্ট্রীটে বাসা করে পরিবার—পরিজনদের রেখেছিলেন।

শ্রীশ্রীমাকে তিনি সাধ্যমতো অর্থসাহায্য করেছেন, করেছেন বরাহনগর ও আলমবাজার মঠবাসী গুরুভাইদেরও। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, সদব্যয়ের জন্য, সাধুসেবার জন্য বেশি রোজগার করায় দোষ নেই। তাই এইসময় শ্রীম একসঙ্গে তিনটি স্কুলের দায়িত্ব স্বীকার করেন।[২৯]

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২৫ মার্চ জয়রামবাটী থেকে স্বামী সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ) শ্রীমকে লেখেন, ''জগদ্ধাত্রীপূজার জন্য সাড়ে তিন বিঘা নিষ্কর জমি কেনার জন্য পত্রপাঠ তিনশো কুড়ি টাকা পাঠাবেন—শ্রীশ্রীমার হুকুম। মঠে বা অন্য কারও কাছে প্রকাশ করবেন না।'' শ্রীম অনুগত সন্তানের মতো সেই টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেন।[৩০]

১৮৯৪—এর নভেম্বরে শ্রীম পত্নী ও আত্মীয়দের নিয়ে পুরীধাম যান। ১৮৯৫—এর জানুয়ারি পর্যন্ত তীর্থবাস করেন।

তীর্থভ্রমণ প্রসঙ্গে শ্রীম বলেছেন, ''টাকাকড়ির ওপর লক্ষ্য রাখা উচিত। খালি 'ভাবে' থাকলে হবে না। টাকাকড়ি থাকলে নিশ্চিন্ত আনন্দে তাঁর দর্শন ভজন সব হয়। আহারের ব্যবস্থা না থাকলে মন চঞ্চল হবে। ঠাকুর তাই বলেছিলেন, 'ভক্তদের যদি অর্থ থাকে, তবে তারা অর্ধজীবন্মুক্ত।' আমাকে বলেছিলেন, পুরী যাওয়ার আগে, 'বিদেশে যাচ্ছ, অনেক টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে যাবে। তাতে মন শান্ত থাকে'।''[৩১]

অন্য এক ভক্ত (শান্তিকুমার মিত্র)—কে শ্রীম বলেছিলেন, ''...টাকা যেমন বন্ধনের কারণ, আবার ওই টাকাই মুক্তির কারণও হতে পারে, তাঁর ভক্তের পক্ষে। শ্রীগুরুর সেবা, সাধুসেবা, তীর্থ, কোনও নির্জন স্থান গিয়ে সাধন—ভজন, দান—এ—সব মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। পয়সাকড়ির সচ্ছলতা থাকলে সংসারের

ভাবনাচিন্তা কতকটা কম থাকে, আর মনটা সব তাঁর শ্রীপাদপদ্মে দিতে চেষ্টা করতে পারা যায়। তাঁর উদ্দেশে যদি টাকার ব্যবহার হয় তো আলাদা কথা, নচেৎ টাকাই বন্ধনের কারণ হয়।"[৩২]

১৮৯৫—এ বৃন্দাবন ও কাশী ঘুরে ফেরার পথে শ্রীশ্রীমা এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় একমাস শ্রীম'র কলুটোলার ৫২ নং ভবানী দত্ত লেনের ভাড়াবাড়িতে বাস করেন।

১৮৯৪—৯৫—এর পর আবার ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীশ্রীমা পুরীধামে গেলে নিকুঞ্জদেবী তাঁর সঙ্গে যান। পরে শ্রীমও পুরীধামে আসেন। ১৯০৫—এর জানুয়ারি মাসে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গেই তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন।

এর কিছুদিন পরেই ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দেই শ্রীম চাকরির বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্বাধীনভাবে শিক্ষকতা শুরু করলেন ঝামাপুকুরের মর্টন ইনস্টিটিউশনটি কিনে নিয়ে। তখন শ্রীম'র বয়স একান্ন বছর। এর কিছুদিন পরে স্কুলটিকে তিনি ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটি চারতলা বাড়িতে স্থানান্তরিত করেন। এই বাড়ির চারতলার সিঁড়ির পাশের ঘরটি নিজের ধ্যানভজনের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখেন। এই বাড়িরই তিনতলার উত্তরাংশে থাকত তাঁর পরিবার—পরিজন। বাড়ির বাকি অংশ স্কুল হিসাবে ব্যবহৃত হত। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই মর্টন ইনস্টিটিউশন—পরে যার নাম হয় শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন—তার রেক্টর ছিলেন।

৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটের স্কুল বাড়ির চারতলার ছাদের উত্তরাংশে বড় বড় টবে অনেক ফল ও ফুলের গাছ লাগান শ্রীম; সঙ্গে অনেক তুলসীগাছও ছিল। উন্মুক্ত আকাশের নিচে ছাদের এই অংশটির দিকে তাকালে ঋষির তপোবনের মতো মনে হত। সময়—সুযোগ পেলেই এই বৃক্ষরাজির মধ্যে একাকী নির্জনে বসে শ্রীম জপধ্যান করতেন।

ইতিমধ্যে 'Gospel of Sri Ramakrishna' দুখণ্ড (প্রকাশকাল—১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দ) এবং 'কথামৃত' প্রথমভাগ (১৯০২ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয়ভাগ (১৯০৪ খ্রীঃ) প্রকাশিত হওয়ার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ—কথার ভাণ্ডারী শ্রীম, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ও ভক্তমণ্ডলীর বিশেষ আগ্রহের পাত্র হয়ে ওঠেন। শ্রীম যখন নিশ্চিন্তে মর্টন ইনস্টিটিউশনের চারতলায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যানে রত তখন ধীরে ধীরে কাছের ও দূরের ভগবদ—মৌ—পিয়াসী কিছু মানুষ তাঁর সন্ধান করতে করতে সেখানে এসে জোটেন। শ্রীমকে ঘিরে এক ভক্তমণ্ডলী গড়ে ওঠে। এঁদের মধ্যে তরুণ ও যুবক ভক্তেরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। এদের কেউ কেউ স্কুল—কলেজের ছাত্র, কেউ বা আবার তাঁরই স্কুলের তরুণ শিক্ষক। ঠাকুর যে তাঁকে একসময় বলেছিলেন, তাঁকে মা (জগদম্বা)—র একটু কাজ করে দিতে হবে, লোককে ভাগবত কথা শোনাতে হবে, যার জন্য ঠাকুর তাঁকে চাপরাশও দিয়েছিলেন, এবার সেই কাজ তিনি পুরোদমে শুরু করে দিলেন। সংস্কারবান যুবকদের নিজের কাছে রেখে সাধুজীবনের জন্য তাদের শ্রীম প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন হাতে—কলমে।

শ্রীম স্বয়ং ভোরবেলা উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে আধঘণ্টা—একঘণ্টা থেকে কখনও তিন—চার ঘণ্টা পর্যন্ত ধ্যান করেন। দুপুরের আহারের পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ধ্যানে বসেন। এরপর সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বললেই আবার ধ্যানে ডুবে যান। ধ্যানের ফাঁকে সকাল—বিকেল বা সন্ধ্যার পর শাস্ত্রকথা বা শ্রীরামকৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করেন। আবার কখনও বা ঠাকুরের গাওয়া বিভিন্ন গান নিজে করেন, গান—জানা ভক্তদের একাদিক্রমে চার—পাঁচটা থেকে কুড়ি—পঁচিশটা পর্যন্ত গান গাইতে অনুপ্রাণিত করেন। ফলে তাঁর কাছে যেসব ভক্ত থাকেন, তাঁদের জীবনও এই অনুশাসন মেনে চলতে চলতে ধীরে ধীরে ভগবদমুখী হয়ে ওঠে।

স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ) একবার বেলুড় মঠে দুর্গোৎসবের সময় শ্রীম'র দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর ওঁর (শ্রীম'র)—ই তো কৃপায় সব। ইনিই তো ঠাকুরের কাছে ধরে নিলেন (নিয়ে গেলেন) তাই।" স্বভাবত নিরভিমান শ্রীম ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাত—জোড় করে বললেন, "শুদ্ধসত্ত্ব আধার! তাঁর সঙ্গে করে আনা! আমি আবার কে? আমাকে কেন অপরাধী করা হচ্ছে?" বাবুরাম মহারাজ একটুও দমিত না হয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "হ্যাঁ, আগে আপনার কৃপা, তারপর ঠাকুরের। আর শুধু কি কৃপা করে ধরে নিয়ে

(গিয়ে) ছিলেন? মাঝে মাঝে স্কুল হতে ঠাকুরের কাছে পালিয়ে যাবার সুযোগটি দেননি? নিজেও সঙ্গে করে কি পালিয়ে নেননি?'' শ্রীম এবার খুব হাসতে লাগলেন। ঠিক তখনই শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলেন—তাই তো নাম হয়েছে, ছেলেধরা মাস্টার।[৩৩]

শ্রীম'র মধুর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে যেসব তরুণ ভক্ত তাঁকেই গুরুরূপে বরণ করে অধ্যাত্মজীবন গড়ে তুলতে চান, স্বাভাবিক বিনয়ে নিরভিমান শ্রীম তাঁদের বোঝান, সন্ন্যাসীর জীবনই আদর্শ এবং আদর্শ সন্ন্যাস—জীবনই অনুসরণীয়। তাই তাঁদের তিনি বেলুড় মঠে যেতে উৎসাহিত করেন, ঠাকুরের সন্ন্যাসি—সন্তানদের সঙ্গ করতে উপদেশ দেন। তাঁদের বুঝিয়ে বলেন, ঠাকুর যে শুধু সন্ন্যাসীর জীবনকেই আদর্শ বলেছেন তা নয়, পরবর্তী প্রজন্মের ঈশ্বরলাভেচ্ছু ভক্তদের জন্য আদর্শ সন্ন্যাসীও তৈরি করে রেখেছেন বেলুড় মঠে। তাঁর মুখের কথাই ছিল, ''এখন বড্ড chance। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অবতার এই সবে একাদিক্রমে তিরিশ বছর দক্ষিণেশ্বর মন্দির—প্রাঙ্গণে বাস করে স্বধামে ফিরে গিয়েছেন। এখনও তাঁর প্রভাব দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিটি ধূলিকণা, গাছপালা, ঘরবাড়িতে জীবন্ত হয়ে রয়েছে। অধ্যাত্মজীবন গড়ার এই সুযোগ ছাড়তে নেই।''

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের দুর্গাপুজোর পর ৫ নভেম্বর শ্রীম সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কাশীধামে যান। সেখানে কিছুদিন বাস করার পর একাই উত্তরাখণ্ডে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। এই যাত্রায় প্রথমে হৃষীকেশের মায়াকুণ্ডে ও পরে স্বর্গাশ্রমে ভিক্ষান্নভোজী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একত্রে চার—পাঁচ মাস এক কুটিয়ায় থেকে তপস্যা করেন। স্বর্গাশ্রম বন—জঙ্গলে ঘেরা পার্বত্য নির্জন স্থান। তার ওপর সামনেই বিষ্ণুপাদোদ্ভবা স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা, আর চারপাশে সংসারে বীতস্পৃহ সন্ন্যাসীরা সর্বদা ব্রহ্মচিন্তা ও শাস্ত্রাদি পাঠে নিমগ্ন—এইসব দৃশ্য তাঁর কবিমনে আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিত্যনতুন ভাবের উদ্দীপনা জাগিয়ে দিত।[৩৪]

এরপর হরিদ্বারে কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম থেকে কিছু দূরে গঙ্গার ধারে একটি কুটিয়াতেও মাসাধিক কাল থেকে শ্রীম তপস্যা করেন। তখন সেখানে হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ), রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), মহাপুরুষ মহারাজও (স্বামী শিবানন্দ) ছিলেন। তাঁরা সকলে মিলে মাঝে মাঝে ব্রহ্মচক্র রচনা করতেন। অন্য সময় ভ্রমণ ও ঠাকুরের বিষয় আলাপ—আলোচনায় দিন কাটাতেন।[৩৫]

বৈদ্যনাথের (দেওঘরের) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সূচনা হয় মিশনের মিহিজাম আশ্রমে। সেখানে থেকে আশ্রমবাসের অনুরোধ আসে অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী বিদ্যাচৈতন্য (পরে স্বামী সদ্ভাবানন্দ) মহারাজের কাছ থেকে। ওই কালে অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং শ্রীশ্রীমায়ের দেহাবসানে শ্রীম'র শরীর ও মন তখন ভেঙে পড়েছিল। তাই বিশ্রামের জন্য শ্রীম ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ২১ অক্টোবর মিহিজাম আশ্রমে এলেন। এই আশ্রমে প্রাচীন তপোবনের আদর্শে সমস্ত কাজকর্ম হয়। শ্রীম অনায়াসে এখানে বর্ষীয়ান ঋষির আসনটি অলংকৃত করে উপস্থিত সাধু—ব্রহ্মচারীদের সাধন—ভজনে যথোপযুক্ত সহায়তা করতে লাগলেন। নিজেও সাধন—ভজনে বহুক্ষণ কাটাতে লাগলেন। আশ্রমের একটি পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি বাস করতে লাগলেন একটি পর্ণকুটিরে। আর ব্রহ্মচারীদের উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত ও কথামৃত নিয়ম করে প্রতিদিন শোনাতে লাগলেন। তাদের ভোরে ও সন্ধ্যায় দূর নির্জন প্রান্তরে একাকী ধ্যান করতে পাঠিয়ে দিতেন। ধ্যানের বিষয়ও তিনি ঠিক করে দিতেন। কলকাতার কিছু ভক্তও তাঁর সঙ্গে এখানে এসে সাধন—ভজনের অভূতপূর্ব সুযোগ পেয়ে যেন এক আনন্দময় ধামে বাস করতে লাগলেন।[৩৬] একটানা প্রায় সাতমাস মিহিজাম আশ্রমে কাটিয়ে ১৯২৩—এর ১০ মে শ্রীম কলকাতায় ফিরে এলেন।

শ্রীম'র শেষ তীর্থযাত্রা পুরীধামে, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ অক্টোবর। সঙ্গে যান তাঁর স্ত্রী ও কিছু ভক্ত। তাঁরা ওঠেন স্বর্গীয় বলরাম বসুর বাড়ি 'শশী নিকেতন'—এ। সেখানে পুরী রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু সাধু ব্রহ্মচারীও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করলেন। এখানে শ্রীম প্রায় চারমাস বাস করেন। প্রতিদিন ভোরে উঠে নির্জন সমুদ্রতটে

বসে দীর্ঘকাল ধ্যান করতেন। তারপর যেতেন জগন্নাথ—দর্শনে। পুরীর মন্দিরের অন্তত পাঁচিশটি জায়গায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, যুক্তকরে প্রার্থনা, পরিক্রমা ও চরণামৃতাদি প্রসাদ ধারণ করতেন।[৩৭]

দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীম ঠাকুরকে বলেছিলেন, "সব চুকে গেলে (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের ইহজীবনলীলা সাঙ্গ হলে) এই স্থান মহাতীর্থ হবে।"[৩৮]

কলকাতায় থাকলে মাঝে মাঝেই শ্রীম ভক্তদের নিয়ে সকালবেলাই চলে যেতেন তাঁর প্রিয় তীর্থ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। সেখানে ঠাকুরের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত প্রতিটি স্থানেই দর্শন, স্পর্শন ও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেন। সারা মন্দির চত্বর, চাঁদনী, বকুলতলার ঘাট, পঞ্চবটী, বেলতলা দর্শন করতেন। সমস্ত পরিক্রমা শেষ করতে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লেগে যেত। অনুগামী ভক্তেরা কখনও ক্লান্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু তাঁর সেদিকে হুঁশ থাকত না। ঠাকুরের ভাবে যেন অর্ধবাহ্যদশায় একটা ঘোরের মধ্যে তিনি পরিক্রমা করতেন। পরিক্রমা সম্পূর্ণ হলে তখন তাঁর মন বাহ্যজগতে ফিরে আসত।

ভবানীপুরে গদাধর আশ্রম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সেখানকার মহন্ত মহারাজের অনুরোধে শ্রীম মাঝে মাঝেই সেখানে সাধু—ব্রহ্মচারী ও তাঁর অনুগত কিছু ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দে কাটিয়ে আসতেন। গদাধর আশ্রমে থাকাকালীন সামনেই আদিগঙ্গায় স্নান করতেন এবং হাঁটাপথে কালীঘাটের মন্দিরে প্রায় দর্শনে যেতেন। এখানেই মন্দির—পরিক্রমা করতেন ও প্রণামাদি করতেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে।

বাবা—মা ও আট ভাই—বোনের বৃহৎ পরিবারে শ্রীম'র জীবনযাত্রা শুরু হয়। বিবাহিত জীবনে শ্রীম'র মোট সাতটি সন্তান হয়—এর মধ্যে তিনটি ছেলে এবং চারটি মেয়ে। ঠাকুরের শরীর থাকাকালীন তিনি মোট ছটি সন্তানের জনক ছিলেন। এর মধ্যে বড় ছেলেটি প্রথম গত হয়; পরে আরও দুটি কন্যারও পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। দীর্ঘদিন শ্রীম'র দুটি পুত্র ও দুটি কন্যা ছিল। এই নিয়ে তাঁর সংসার।

শ্রীম'র পৈত্রিক ভিটা তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর ভায়েদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। পৈত্রিক ভিটার অংশটি বর্তমানে 'ঠাকুরবাড়ি' বলে পরিচিত।

শ্রীমকে ঠাকুর গৃহীর জীবন যাপন করতে বলেছিলেন; এবং কেমন করে তা করতে হবে তাও বলেছিলেন। বলেছিলেন, "কুটুম্ব সেবা করবে না। সাধু—ভক্তের সেবা করবে। ভক্তরাই আপনজন। ভক্তদের দেখলে ভগবানের কথাই স্মরণ হয়।"[৩৯]

আপাতদৃষ্টিতে শ্রীম গৃহী হলেও তাঁর অন্তরটি ছিল সন্ন্যাসীর। তিনি মনে করতেন, গৃহস্থ—সন্ন্যাসী দিবানিশি কাজ করবে সংসারের, কিন্তু ভোগ নেবে না। শরীর ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকই নেবে। তাই সংসারের কাছে তাঁর কোনও দাবি ছিল না। তিনি মনে করতেন, সংসারে যাঁকে দাসীর মতো থাকতে হবে তাঁর কোনও দাবি থাকারই কথা নয়।

শ্রীম'র জীবনযাপন ছিল সরল এবং অনাড়ম্বর। এক জোড়া ধুতি, এক জোড়া পাঞ্জাবী, এক জোড়া কালো বার্ণিশ করা চটি জুতো এবং একটি চাদর—এই ছিল শ্রীম'র জীবনভর পোশাক। পরিণত বয়সে শ্রীম'র আহার ছিল—দিনে দুধ—ভাত, রাতে দুধ—রুটি। শ্রীম'র যে তিনটি ফটো দেখা যায়, সেগুলির একটি বত্রিশ বছর বয়সের, দ্বিতীয়টি পঞ্চাশ বছর বয়সের এবং তৃতীয়টি আনুমানিক সত্তর বছর বয়সের। সবগুলিতেই তিনি শ্মশ্রুমণ্ডিত। প্রকৃতপক্ষে পরিণত বয়সে তাঁর বিরল শ্বেত—শুভ্র কেশ এবং শ্বেত—শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখাবয়বটি ছিল যেন যথার্থ ঋষির প্রতিমূর্তি।

শ্রীম কারও সেবা নিতেন না। কিন্তু সংসারের সমস্ত কর্তব্যই যথাযথ পালন করতেন। তিনি মনে করতেন, পিতা—মাতা জীবিত থাকলে আজীবন তাঁদের সেবা, কন্যাদের সৎপাত্রে দান এবং পুত্রদের উপার্জনক্ষম করাই সংসারীর কর্তব্য। কিন্তু সমস্ত কর্তব্যই করতে হবে নির্লিপ্ত হয়ে।

জপ—ধ্যান—তপস্যার অতিরিক্ত শ্রীম'র অবসর যাপনের একমাত্র অবলম্বন ছিল 'কথামৃতে'র ডায়েরি। এই ডায়েরিগুলি থাকত একটি ময়লা গেরুয়া রঙের বড় ট্রাঙ্কে। তিনি ভক্তদের বলতেন, "ওই ট্রাঙ্কটাতে

আমার প্রাণ—যেমন গল্পে আছে, 'রাক্ষসের প্রাণ ছিল কৌটোতে, ভ্রমরায়'।''[৪০] একবার গদাধর আশ্রম থেকে মর্টন স্কুলে ফেরার পথে ট্রামে 'কথামৃতে'র একটি ডায়েরি ফেলে রেখে নেমে পড়েন (১৯২৪, ১৫ জানুয়ারি)। ডায়েরিটি তাঁর সঙ্গে নেই বুঝতে পারা মাত্রই তিনি যেন সন্তান—বিয়োগ ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েন। অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে ডায়েরিটি উদ্ধার হয়।

ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পর শ্রীম যখন বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে পড়াতেন, তখন সময় ও সুযোগ পেলেই নিভৃত নির্জনে স্কুলবাড়ির ঘরের কোণে বা ছাদের একপ্রান্তে বসে ডায়েরি খুলে পড়তে পড়তে ধ্যানে ডুবে যেতেন। ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে বলে উঠতেন, ''মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন।''[৪১]

তারপর আবার পড়ানো চলত। ছাত্ররা নিশ্চয়ই অবাক হত; কিন্তু তিনি তা খেয়াল করতেন না। তাঁর নিজের স্কুল মর্টন ইনস্টিটিউশনে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের পর তিনি সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীতে 'কথামৃতে'র যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ পাঠ্য করেছিলেন। ছাত্ররা আগ্রহ সহকারে 'কথামৃত' পড়ত না; এবং তিনি এই বই বিক্রির জন্য এমন ব্যবস্থা করেছেন, এই অভিযোগ উঠত। তাতে তিনি বলেছিলেন, ''ছাত্ররা এখন এর উপকারিতা বুঝতে পারবে না; কিন্তু বুঝবে, যখন সংসাররূপ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পড়বে।''

শ্রীম'র ছোট মেয়ের বিয়ে। সম্প্রদানের কাজ মিটতে প্রায় রাত দুটো। বিয়েবাড়ি তখনও জমজমাট। তারই মধ্যে কর্তব্য শেষ করেই শ্রীম নিঃশব্দে ছাদে উঠে হ্যারিকেনের আলোয় 'কথামৃতে'র ডায়েরি খুলে ধ্যানে ডুবে গেলেন—রাত দুটো থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত।[৪২]

শ্রীম'র ছোট ছেলে চারুচন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। শ্রীশ্রীমার কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার। কিন্তু প্রথম যৌবনে জুয়ার নেশা তাঁকে পেয়ে বসে। তিনি নিয়মিত রেস খেলতেন। শ্রীম এ কথা জানতে পেরে তাঁকে বারণ করেন। কিন্তু চারুচন্দ্র পিতার সেই নিষেধ শোনেননি।

তখন একদিন শ্রীম প্রশান্তভাবে বন্ধুর মতো তাঁকে বললেন, ''তুমি এখন উপার্জনক্ষম, শিক্ষিত। গৃহস্থাশ্রমের এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করাই যদি উচিত মনে কর, তবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যা ভালো বোঝ তাই করো। তোমার কাজে এই আশ্রমবাসীরা (অর্থাৎ তাঁর বাড়ির লোকজন, নাতি—নাতনিরা) কুশিক্ষা পাবে।''

সেকথা শুনে ছেলে অভিমানে গৃহত্যাগ ক'রে, মামারবাড়িতে আশ্রয় নিল। স্বর্গত মামা ধনী এবং অপুত্রক ছিলেন। তাই তাঁর মামীমা পুত্রস্নেহে তাঁকে আশ্রয় দিলেন। এবং চারুচন্দ্র আবার যথারীতি রেস খেলতে লাগলেন। কিন্তু ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে বদ্রীনারায়ণ দর্শন করে ফেরার পথে মামীমার মৃত্যু হলে মামার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ভাইপোরা তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি আশ্রয়হীন এবং অন্ন—বস্ত্রহীন হয়ে খুবই দুর্দশায় পড়লেন।

এই সময় একদিন পথে শ্রীম'র এক বিশিষ্ট ভক্ত জগবন্ধু (পরবর্তী কালে স্বামী নিত্যাত্মানন্দ—'শ্রীম—দর্শন' গ্রন্থমালার লেখক)—এর সঙ্গে চারুচন্দ্রের দেখা হল। তাঁর মলিন চেহারা দেখে জগবন্ধু জানতে চাইলেন, চারুবাবু অসুস্থ কিনা। তিনি ম্লান হেসে উত্তর দিলেন—না, রোগ নাই, কিন্তু দুদিন সম্পূর্ণ উপবাসী। আমাকে আপনি ত্রিশটা টাকা দিন।

নিয়মিত ভক্তসেবার জন্য শ্রীম'র কিছু টাকা জগবন্ধুর কাছে থাকত এবং এর যথাযথ হিসেব তাঁকে দিতে হত। শ্রীম'র অনুমতি ছাড়া এই টাকা থেকে কাউকে কিছু দেওয়ার অধিকার তাঁর ছিল না। তাই শ্রীম'র অনুমতি নিতে তিনি মর্টন স্কুলে এলে শ্রীম তাঁকে অনুমতি দিলেন এই শর্তসাপেক্ষে যে, একত্রিশ দিনের দিন এই টাকা ফেরৎ দিতে হবে। চারুবাবু এই শর্তেই টাকা নিলেন এবং একত্রিশ দিনের দিন টাকা ফেরতও দিয়েছিলেন।

এরপর আর একদিন চতুর্থ ভাইপো অনিলের হাত দিয়ে চারুবাবু তাঁর বাবাকে এক চিঠিতে লিখলেন, ''বাবা, I am on the verge of starvation. Please give me some money.” শ্রীম চিঠিটি পড়ে তার পিছনে

লিখলেন, Yes, I will give you whatever you want, but you are to stop going to the horse race. কিন্তু শ্রীম'র শর্তে চারুবাবু টাকা নিলেন না।[৪৩]

শ্রীম স্বভাবত কোমলপ্রাণ, সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। কিন্তু নীতির সঙ্গে তিনি কখনও আপোস করেননি, এমনকি নিজের আত্মজের মুখ চেয়েও নয়। এমনিই দৃঢ় ছিল তাঁর চরিত্র।

মর্টন ইনস্টিটিউশন যখন খ্যাতির শিখরে তখন শ্রীম'র আয় কোনও ধনী পরিবারের থেকে কম ছিল না। সেই স্কুলের কমিটির গঠন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একবার তাঁর মতভেদ হয়, সেই কারণে কর্তৃপক্ষ স্কুলের affiliation নাকচ করেন। তিনি সানন্দে তা স্বীকার করে স্কুলের ওপরকার দুটি ক্লাস তুলে দেন। এতে তাঁর আয় অনেক কমে যায়। একজন ভক্ত (শ্রীগোকুলদাস দে) বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কেন তিনি একমত হলেন না তা জানতে চাওয়ায় শ্রীম বলেছিলেন, "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বঁচিতে চায়।"[৪৪]

শ্রীম'র অধ্যাত্মজীবন ছিল সম্পূর্ণ অহংশূন্য, নিরভিমান। কিন্তু যেহেতু তিনি সংসারেই ছিলেন এবং আপাতদৃষ্টিতে গৃহীর জীবন—যাপন করতেন, তাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রবল এবং অত্যন্ত দৃঢ় ছিল।

শ্রীম সংসারে থেকেও দিবানিশি ঈশ্বরের নাম গুণগান করতেন। তাঁর শ্বাস—প্রশ্বাসের সঙ্গে ধ্বনিত হত—গুরুদেব! গুরুদেব! মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদ এবং সিঁড়ির পাশের ঘরটি ছিল যেন নৈমিষারণ্য—সর্বদা ভগবৎপ্রসঙ্গে মুখরিত। তাঁর কাছে কেউ এসে বসলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে জগৎ, পরিপার্শ্ব ভুলে যেত। এমনই ছিল তাঁর উপস্থিতির দিব্য প্রভাব। এরই মধ্যে সংসারের কর্তব্যও তিনি করছেন।

একবার এক নাতির কঠিন অসুখ। শ্রীম মর্টন স্কুলের তিনতলায় নাতির বিছানার পাশে বসে আছেন। সকলে ব্যতিব্যস্ত। ভক্তরা পর্যন্ত চিন্তিত ও সেবা—পরিচর্যা করতে করতে ক্লান্ত। শ্রীমও সকলের সঙ্গে উদ্বেগের শরিক হয়েছেন। এমন সময় বেলুড় মঠ থেকে এক সন্ন্যাসী এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি চারতলায় উঠে এলেন। এসে আগন্তুক সাধুর কানে কানে বলছেন—ঠাকুর বলেছিলেন, সংসার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড—এইজন্য। শ্রীম যেন সাধুরই চৈতন্য করার জন্য ঠাকুরের এই কথা তাঁকে বলছেন।

সাধক—ভক্ত—সাধু—ব্রহ্মচারী সকলেরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীম সাধক—জীবনের বিপদ সম্পর্কে সাবধান করতে একদিন ব্রহ্মচারী যতীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, "নির্জনে একলা ঘরে থাকলে কাম সকলের আগে উগ্রমূর্তি হয়ে ওঠে। অন্য কামনা—বাসনা যা দশ জনের মধ্যে মাথা তুলতে সুযোগ পায় না, তা প্রবলভাবে আক্রমণ করে। নির্জনে গেলে নিজের স্বরূপ চেনা যায়, অহংকার দূর হয়, ভবিষ্যতের জন্য সাধক সাবধান হন। চঞ্চল—চিত্ত সাধকের পক্ষে নির্জনবাস বিপজ্জনক।"[৪৫]

একই প্রসঙ্গে দক্ষিণভারত থেকে আসা এক ভক্ত, এন. বঙ্গরায়কে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে শ্রীম বলেছিলেন—সে—ই প্রকৃত সাধক যে কামাদির তাড়না সত্ত্বেও ভগবানের দিকে মন রাখতে পারে। এর মধ্যেই মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

বঙ্গরায়—আমরা ওই মহত্ত্বের বহূদূরে; আর আমাদের যন্ত্রণা অসহনীয়।

শ্রীম—ভগবানলাভের পর ওই যন্ত্রণার বিন্দুমাত্রও থাকে না। তুমি বিরক্ত বোধ করবে না, কারণ তুমি অনেক ভুগেছ। মনের কামের সঙ্গে সংগ্রামাদি দেখে তুমি হাসবে।[৪৬]

ভক্তবৎসল শ্রীম, শ্রীবঙ্গরায় বেলুড় মঠে এসেছেন শুনে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন—তুমি কি তাঁর (তদানীন্তন মঠাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের) কাছ থেকে দীক্ষার জন্য এসেছ?

বঙ্গরায়—এ ব্যাপারে আমার একটু অহংকার আছে। আমি মনে মনে ঠিক করেছি শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আমি দীক্ষা নেব না। আমার এ বাসনা কি পূর্ণ হবে?

শ্রীম—ঈশ্বরের কৃপা যদি হয় তবে বাধা কী?

শ্রীম'র দেহরক্ষার অল্প কিছুদিন আগে ৮ মে, ১৯৩২—এ শ্রীম'র বড় নাতি অরুণের বিয়ে হয় মর্টন স্কুলের বাড়িতে। বিয়ের আসরের কোলাহল থেকে দূরে 'ঠাকুরবাড়ি'তে (বর্তমান কথামৃত ভবন) শ্রীম তখন 'কথামৃত' পঞ্চ ভাগ প্রকাশের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

'কথামৃত' রচনা, প্রকাশ ও প্রচারের ইতিবৃত্ত

'কথামৃত' রচনা প্রসঙ্গে শ্রীম বলেছেন, ''আমার ছেলেবেলা থেকে ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। যখন যেখানে ভালো বক্তৃতা বা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনতাম, তখনই বিশেষভাবে লিখে রাখতাম। সেই অভ্যাসের ফলে ঠাকুরের সঙ্গে যেদিন যা কথাবার্তা হত, বার, তিথি, নক্ষত্র, তারিখ দিয়ে ডায়েরিতে লিখে রাখতাম।''[৪৭]

শ্রীম আরও বলেছেন, ''আমায় ঠাকুর এমন করে দিছলেন, সাত—আট ঘণ্টা শুনছি তাঁর কথা, তাঁকে watch করছি, রাত্রিতে বাড়ি এসে সব লিখছি। সব মনে থাকত। ... আর পাঁচ বছর [ধরে] লিখছি কেউ জানত না।''[৪৮]

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ আগস্ট মধ্যরাত্রে ঠাকুর অমৃতলোকে পাড়ি দিলে অন্তরঙ্গ—ভক্তরা সব দিশাহারা, পাগলের মতো হয়ে গেলেন। সেই শূন্যতার বেদনা ভুলতে একেকজন একেকরকম পন্থা অবলম্বন করলেন। শ্রীম জপ—ধ্যান—তপস্যা প্রবলভাবে শুরু করলেন কর্ম—জীবনের ফাঁকে ফাঁকে। আর তাঁর নিত্য অবলম্বন হয়ে উঠল এক ট্রাঙ্ক—ভর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ—কথার ব্যক্তিগত ডায়েরি। সময় সুযোগ পেলেই নিভৃত অবকাশে ডায়েরির কোনও একটি পাতা খুলে তাতে কোনও একটি দিনের বিবরণ চিন্তা করতে করতে ধ্যান—মগ্ন হয়ে যান—চোখের সামনে ভেসে ওঠেন সচ্চিদানন্দ—বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীম'র ডায়েরির প্রতিলিপি দেখলে বোঝা যায় তিনি বিস্তৃত বিবরণ কখনও লিপিবদ্ধ করেননি—যেমন আমরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'—এর মুদ্রিত রূপে দেখতে পাই। ডায়েরিতে তিনি যেন নাটকের বর্ণনা দিচ্ছেন, খুব সংক্ষেপে। প্রকৃতপক্ষে কতকগুলো দৃশ্যের ছবি খুব সংক্ষেপে আঁকছেন; কতকগুলো বিশেষ শব্দ বা ঠাকুরের বিশেষ কোনও বাক্য লেখা রয়েছে। বর্ণনা আছে সিন ওয়ান, সিন টু ইত্যাদি ক্রমে। কিন্তু তিনি যখন এগুলিই তাঁর চোখের সামনে মেলে ধরছেন তখন তাঁর অতিমানুষিক মেধা ও স্মৃতিশক্তি তাঁর কাছে সমস্ত দৃশ্যটি—তার পাত্র—পাত্রী, পারিপার্শ্বিক—এমনকি কথাবার্তা পর্যন্ত জীবন্ত করে তুলছে। তিনি নিজেও এই দৃশ্যেরই অন্তর্গত হয়ে যাচ্ছেন। আসলে ডায়েরির এই চিত্রাবলী শ্রীম'র মানসপটেই কেবল পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ পেয়েছে এবং তিনি নিরপেক্ষ দর্শকরূপে সেই চলচ্চিত্রের ধারা— বিবরণী 'কথামৃত' পাঁচ ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ—অনুরাগেদের উপহার দিয়েছেন।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের মে মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ভাড়া বাড়িতে ছিলেন। এখানেই ১১ জুলাই শ্রীম 'কথামৃতে'র ডায়েরি থেকে ঠাকুরের কিছু উপদেশ শ্রীশ্রীমাকেই প্রথম শোনান।

১৮৮৯—এর ১২ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা শ্রীম'র ভাড়াবাড়িতে কাটিয়ে আঁটপুরে বাবুরাম মহারাজদের বাড়িতে যান। সে—সময় নরেন্দ্রনাথাদি গুরুভাইদের সঙ্গে শ্রীমও আঁটপুরে যান। অনুমিত হয় যে, শ্রীশ্রীমাকে শ্রীম প্রথম তাঁর ডায়েরি থেকে ঠাকুরের কিছু উপদেশ শোনানোর পর সম্ভবত ঠাকুরের উপদেশের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন প্রস্তুত করেন এবং সেটি আঁটপুরে নিয়ে যান। সেখানে সেটি নরেন্দ্রনাথকে পড়তে দেন। নরেন্দ্রনাথ তখন মৌন অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু উপদেশের সংকলনটি পড়ে যার—পর—নাই প্রীত হয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি লিখিতভাবে এই সংকলনটির উচ্চ প্রশংসা করেন।

শ্রীম তপস্যার জন্য মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গিয়ে বাস করতেন। তেমনই একবার ১৩ অক্টোবর ১৮৮৯ তারিখে নহবতের ঘরে শুয়ে আছেন, এমন সময় শ্রীম এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন, ঠাকুর ও মা যেন বড় কড়ায় দুধ জ্বাল দিচ্ছেন, আর চারিদিকে তার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। শ্রীম'র মনে হল,

ঠাকুর ও মা দুজনে মিলে প্রেমামৃত তৈরি করছেন এবং যেন তাঁর ওপর দায়িত্ব পড়েছে সকলকে তা বিতরণ করার। শ্রীম'র মনে পড়ে যায়, মায়ের কাজ করার কথা; ভাবেন, আর তো দেরি করা চলে না।

সম্ভবত তারপর থেকেই শ্রীম প্রথম ঠাকুরের উপদেশাবলীর একটি সংকলন প্রকাশের চিন্তা করেন। ঠাকুরের অমৃতকথার সংকলন বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশ করেন কেশবচন্দ্র সেন, 'পরমহংসদেবের উক্তি' নামে একটি পুস্তিকায়, ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি। তারপর ব্রাহ্মসমাজের গিরিশচন্দ্র সেন ওই একই ধারায় 'পরমহংসদেবের উক্তি' এই একই নামে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে। এই নামকরণটি জনসমাজে গৃহীত ও আদৃত হওয়ার ফলেই অনুমিত হয় যে শ্রীম স্বতন্ত্রভাবে হলেও এই ধারারই অনুসরণে 'পরমহংসদেবের উক্তি'—তৃতীয় ভাগ—রূপে তাঁর সংকলিত উক্তিগুলি প্রকাশ করেন ১৮৯২ খ্রস্টাব্দে। ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশনার থেকে এটি যে ভিন্ন তার ইঙ্গিত দেওয়া হয় এইভাবে— ''সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন দ্বারা প্রকাশিত।... সাধু মহীন্দ্রনাথ গুপ্তের কৃপায় ইহা সংগৃহীত হইল।'' 'সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন' সম্ভবত ছদ্মনাম—এ বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ৪ মার্চ থেকে প্রায় এক মাস শ্রীশ্রীমা শ্রীম'র কম্বুলিটোলা ২ নং হেম কর লেনের বাড়িতে বাস করেন। এখানেই ৫ মার্চ শ্রীম ঠাকুরের কথার ডায়েরির অংশ শ্রীশ্রীমাকে পড়ে শোনান।

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ অক্টোবর, মর্টন স্কুলের ছাদে সমবেত ভক্তদের শ্রীম বলছেন, ''একটি সিনের কথা মনে পড়ছে। তখন ১৮৯৪, ঠাকুরের শরীর গেছে আট বছর। আমি পুরী গেছি। উঠেছি পাণ্ডার বাড়িতে। বাবুরাম তখন আছেন বলরামবাবুর [পুরীর] বাড়ি 'শশী নিকেতনে'। বলরামবাবুও রয়েছেন সেখানে। মন্দিরে দেখা হল। তখন ধরে নিয়ে এলেন আমায় 'শশী নিকেতনে'।

''তখনই প্রথম 'কথামৃত' পড়ে শুনাই যেমন পাঠকরা করে। বাড়ির সকলেই আছেন। অনেক স্ত্রীলোক বসা ওখানে পর্দার আড়ালে। বাইরে পুরুষরা। বাবুরাম, বলরামবাবু—এঁরাই প্রধান শ্রোতা। তখনও বই বার হয় নাই—ডায়েরি মাত্র।''[৪৯]

শ্রীম'র উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে মনে হয় তাঁর ডায়েরি থেকেই সরাসরি তিনি ঠাকুরের বাছা বাছা কথাগুলি শ্রোতাদের কাছে পড়ে শোনান। 'কথামৃত' পুস্তকাকারে আমরা যেভাবে পাই, তখনও তার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়নি। তবে এটা খুবই সম্ভব যে, তিনি ঠাকুরের কথাগুলি বলার সময় তাঁর নোটের ভিত্তিতে স্মৃতি থেকে নিশ্চয়ই সেই বিশেষ দিনের দৃশ্যটি, তার পরিবেশ, সেখানে উপস্থিত পাত্র—পাত্রীদের পরিচয় ইত্যাদি মুখে মুখেই বর্ণনা করেছেন, যেমন কথকরা করে থাকেন।

'কথামৃত'র পাণ্ডুলিপি তখনও যে তৈরি হয়নি, এই ধারণার সপক্ষে আরও একটি তথ্য এইরকম। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৬ নভেম্বরে, শ্রীশ্রীমা একপত্রে শ্রীমকে লিখছেন—যে বিষয়গুলি (ঠাকুরের কথাগুলি) বাছিয়া রাখার কথা বলিয়াছিলে [ন?]—সেগুলি বাছিয়া রাখিবেন।

উপর্যুক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আরও অনুমান করা যেতে পারে যে, ঠাকুরের বাছা বাছা কথাগুলি জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীম শ্রীশ্রীমার সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করে থাকবেন এবং অবশ্যই তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করে থাকবেন।

সেই অনুমতি প্রার্থনার উত্তরেই শ্রীশ্রীমা ১৮৯৭—এর ৪ জুলাই শ্রীমকে আশীর্বাদ করে লিখলেন, ''একসময় তিনিই (ঠাকুর) তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমতো তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। এ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে।''

ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা, যা শ্রীম তাঁর ডায়েরির পাতা থেকে অনুরাগী ভক্তদের কিছু কিছু শুনিয়েছিলেন, তা অবশ্যই বাংলায় এবং তাঁর ডায়েরির যা নোট তাও মূলত বাংলাতেই লেখা। সঙ্গে কিছু ইংরেজি শব্দও আছে। তবুও লিখিতরূপে প্রকাশনার সময় তিনি নিশ্চয় ভেবে থাকবেন যে, বাংলাদেশের বাইরে এবং ভারতবর্ষের বাইরে যে বৃহৎ ভক্তগোষ্ঠী, তাদের কাছে এই অমূল্য সম্পদ পৌঁছে দিতে হলে তা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে করাই বাঞ্ছনীয়। সম্ভবত সেই ভাবনা থেকেই শ্রীম রচিত প্রথম দুটি 'প্যামফ্লেট' প্রবন্ধরূপে

প্রকাশিত হয় স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 'ব্রহ্মাবাদিন' নামের ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকার ১৫ অক্টোবর এবং ১৬ নভেম্বর ১৮৯৭ সংখ্যায়। এছাড়াও শ্রীম'র লেখা আরও দুটি প্রবন্ধ 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার ১ ফেব্রুয়ারি এবং ১৬ মে, ১৮৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই চারটি প্রবন্ধেরই শীর্ষক ছিল—Leaves from the Gospel of Sri Ramakrishna.

এছাড়া, মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত আরেকটি ইংরেজি পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'—এও 'গসপেল'—এর কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল। সর্বপ্রথম প্রকাশটি হয় মার্চ, ১৮৯৮—তে।

পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত 'গসপেল'—এর প্রথম দুটি খণ্ড পড়ে স্বামী বিবেকানন্দ অক্টোবর, ১৮৯৭ ও ২৪ নভেম্বর ১৮৯৭—তে দুটি প্রশস্তি পত্র শ্রীমকে লিখে পাঠান। কিন্তু তার সঙ্গে তিনি এ কথাও লেখেন যে, ''পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না।''

এই দুখণ্ড 'গসপেল' প্রকাশিত হওয়ার পর চারদিক থেকে শ্রীম'র ওপর প্রশংসা বর্ষিত হতে থাকে। এরপরই ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত যোগোদ্যান থেকে প্রকাশিত 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ, ১৩০৪ সালে (১৮৯৭) লিখলেন, ''শ্রদ্ধাস্পদ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত... প্রভুর প্রতি তাঁহার যেরূপ বিশ্বাস, সেরূপ বিশ্বাসের পরিচয়স্বরূপ প্রভুর উক্তিগুলি মনুষ্যশক্তি সঙ্গত চেষ্টায় সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেছেন... গুপ্ত মহাশয়ের নিকট আমাদের অনুরোধ, এই উপদেশগুলি খণ্ডাকারে বাহির না করিয়া একেবারে বৃহদাকারে মুদ্রিত করিলে সাধারণের বিশেষ কল্যাণ হইবে। দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে, তিনি বাংলা ভাষা পরিত্যাগ করিলেন কেন? গভীর ভাবপূর্ণ তত্ত্বকথা ইংরেজিতে তর্জমা করিলে অনেক স্থলে ভাবান্তর হয়, তাহা তাঁহাকে বলিবার আবশ্যকতা নাই। এদেশের সর্বসাধারণের পক্ষে তাহা দুর্বোধ্য হইয়া উঠিবে।''

রামচন্দ্র দত্তের উপর্যুক্ত লিখিত অনুরোধ জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়ার পরই দেখা যায় যে শ্রীম সমস্ত সংকোচ ও দ্বিধা (শ্রীরামকৃষ্ণ কথা—প্রকাশের প্রথম দিকে প্রশংসার সঙ্গে কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনাও হয়েছিল) মুক্ত হয়ে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বাংলায় 'কথামৃত' লেখার কাজে লেগে যান এবং সে—সময়ের নানা পত্র—পত্রিকায় 'কথামৃতে'র বিভিন্ন অংশ প্রকাশিত হতে থাকে। রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশনের সাপ্তাহিক সভায়ও 'কথামৃত' পাঠ করে শোনান শ্রীম।

স্বামী দেশিকানন্দ ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে বেলুড় মঠে আসবেন বলে বেরিয়ে মাদ্রাজ হয়ে প্রথম ভুবনেশ্বর মঠে আসেন। সেখানে স্বামী বিশুদ্ধানন্দের পরামর্শে তিনি পুরী যান। শ্রীম তখন সেখানে বাস করছিলেন 'শশী নিকেতনে'। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে শ্রীম'র সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও হৃদ্যতা হয়। সেখানেই একদিন তিনি শ্রীমকে জিজ্ঞেস করেন, কীভাবে তিনি 'কথামৃত' লিখেছেন। শ্রীম তাঁকে বলেন, ''আমি তাঁর 'কথামৃত' স্মৃতিতে বহন করে আনতাম এবং বাড়িতে এসে ডায়েরিতে তার সংক্ষিপ্ত নোট লিখে রাখতাম। অনেক সময় একদিনের কথার নোট সাতদিন ধরে স্মৃতি থেকে বের করে লিখতাম। তাঁর একেকটি কথার জন্য আমি চাতকের মতো চেয়ে থাকতাম।'' ডায়েরির নোট থেকে পুস্তকাকারে বহু পরে 'কথামৃত' লিখিত হয়। ''একেকটি সিন আমি হাজার বারের বেশি ধ্যান করেছি। কাজেই বহু পূর্বে অনুষ্ঠিত সেই লীলাকথা আমার চোখের সামনে ঠাকুরের কৃপায় জীবন্ত হয়ে ভাসত, যেন এইমাত্র দেখে এলাম—বহু [প্রায় চল্লিশ] বৎসর পূর্বে এই ঘটনা অনুষ্ঠিত হলেও। কাজেই এই ভাবে বলা যেতে পারে যে ঠাকুরের জীবন্ত সম্মুখেই লেখা হয়েছে। অনেক সময় ঘটনার বিবৃতিতে মন প্রসন্ন হত না। তখনই ঠাকুরের ধ্যানে নিমগ্ন হতাম। তখন সঠিক চিত্রটি মনশ্চক্ষুর সামনে উজ্জ্বল ও জীবন্তভাবে প্রকাশিত হত। কাজেই লৌকিক জগতে সময়ের এত বড় ব্যবধান থাকলেও আমার চিন্তার জগতে ইহা সদ্য অনুষ্ঠিত বলে প্রতিভাত হত।''[৫০]

১৯৩১—এর আগস্ট মাসে মর্টন স্কুলের ছাদে ভক্তসভায় নবাগত এক ভদ্রলোক শ্রীমকে প্রশ্ন করেন, ''মহাশয়, আপনি যে 'কথামৃত' লিখেছেন— তা ডায়েরি থেকে?''

শ্রীম—হাঁ, ডায়েরি থেকে। তবে তিনিই লিখিয়েছেন।

ভদ্রলোক—আপনি কি তাঁর সামনে বসে টুকে নিতেন?

শ্রীম—না, না,—বাড়ি এসে।

ভদ্রলোক—তা হলে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা তো [ছিল]। আর আপনার বৈষয়িক কাজকর্ম তো ছিল।

শ্রীম—হাঁ, তখন স্কুল ছিল, বৈষয়িক কাজকর্ম খুব ছিল, ভুলে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা ছিল। তিনিই স্মৃতিরূপে তখন হৃদয়ে ছিলেন এবং তিনি স্মৃতি হয়ে তখন লিখিয়েছিলেন।[৫১]

শ্রীম'র ছিল অতিমানুষিক মেধা ও স্মৃতিশক্তি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর কবিপ্রকৃতি। আর ছিল অনায়াস সাহিত্য—রচনার সহজাত প্রতিভা। ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই ছিল তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা। কিন্তু 'কথামৃত' কোনও প্রথাগত সাহিত্যকর্ম নয়। সকল প্রথার উর্ধ্বে এ এক অনুপম সৃষ্টি। প্রথাগত সাহিত্যে সচরাচর সবক্ষেত্রেই সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের এবং দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট ছাপ পড়ে। কিন্তু 'কথামৃতে' রচনাকারের ছায়ামাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। এ অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হল? এই সম্ভাবনার পিছনে সুস্পষ্ট দুটি কারণ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথম কারণ—শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম পরিচয়ের পর পরই শ্রীম'র অহংকার একেবারে চূর্ণ করে মুছে দিয়েছিলেন। তাই 'আমি কর্তা', অজ্ঞানজনিত এই অভিমান শ্রীম'র মধ্যে একেবারেই ছিল না। কাজেই, 'আমি শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাগবত কথা শোনাচ্ছি—হে ভক্তবৃন্দ তোমরা শোনো', এ ভাবটি 'কথামৃতে' সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় কারণ—'কথামৃত' রচনার বিশেষ পদ্ধতি। 'কথামৃতে'র ডায়েরির প্রতিলিপি দেখলে অনায়াসে বোঝা যায়, শ্রীম ভিন্ন দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির পক্ষেই এই ডায়েরি থেকে পুস্তকাকারে আমরা যা পেয়েছি তা সৃষ্টি করা কখনও সম্ভব নয়। কারণ, ডায়েরিতে যেসব ইঙ্গিত এবং ঠাকুরের কথার যেসব সংক্ষিপ্তকরণ রয়েছে তার যে পূর্ণাঙ্গ রূপ তা পরিপূর্ণরূপে ছিল কেবল শ্রীম'র চিত্তপটে স্মৃতিরূপে। তাকে তিনি স্বয়ং ছাড়া আর কে উদ্ধার করতে পারবেন?

শ্রীম নিজেই বলেছেন, ডায়েরির পাতা খুলে একেকটি দিনের ঘটনাবলী তিনি হাজারবারেরও বেশি ধ্যান করেছেন। আর সেইভাবেই একেক দিনের প্রতিটি ঘটনা, পারিপার্শ্বিক, খুঁটিনাটি বিবরণ, পাত্র—পাত্রী, তাঁদের কথাবার্তা, সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে জীবন্তরূপে। প্রকৃতপক্ষে সেই দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে যেন তিনি তার ধারাবিবরণী (running commentary) বলে যাচ্ছেন। সেখানে তিনি নিজেকেও নিজের থেকে আলাদা করে দেখতে পাচ্ছেন এবং ঠাকুরের কথা শুনতে শুনতে যখন তাঁর যা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, নির্লিপ্ত হয়ে তারও বিবরণ দিয়ে যাচ্ছেন অসম সাহসিকতায়। এর সঙ্গেই তাঁর সাহিত্য রচনার কলা—কৌশলের বোধও জাগ্রত। এইসব বিশেষত্বই 'কথামৃতে'র অনন্য সম্পদ। পাছে একই 'মাস্টার' (শ্রীম স্বয়ং) সমস্ত ধারাবিবরণীর সিংহভাগ দখল করে বসলে পাঠকের বিরক্তি আসে, তাই একাধিক নাম—মণি, মোহিনীমোহন, একজন ভক্ত, ইংলিশম্যান, মহেন্দ্র (একবারই এই স্বনাম ব্যবহার করেছেন)—প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন।

পারিপার্শ্বিক বর্ণনার ক্ষেত্রে দিন, ক্ষণ, তিথি, বার, নক্ষত্র ছাড়াও দক্ষিণেশ্বরের ফুলের বাগান, ঝাউবন, পঞ্চবটী, বেলতলা, গঙ্গা ও তার পোস্তার সংক্ষিপ্ত কাব্যিক বিবরণ পাঠকের চোখের সামনে তিনি এমনভাবে মেলে ধরেছেন যে, পাঠক অনায়াসেই তার মধ্যে যেন নিজেকে খুঁজে পায়; মুগ্ধচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভে ধন্য হয়।

এ—প্রসঙ্গে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীম এক ভক্তকে (রমেশচন্দ্র সরকার) বলেন—এবার ঠাকুর কী করিয়ে নিলেন। আর কোনও অবতারে এরূপ হয়নি। 'কথামৃত'টি ঠিক যেন ফোটোগ্রাফের ছবি। স্থান,

সময়, তিথি এমনকি জোয়ার—ভাঁটা পর্যন্ত সব এতে বর্ণিত আছে। যদি কেউ একবার দক্ষিণেশ্বর দেখে এসে এ—বই পড়ে তবে ধ্যান হয়ে যায়। ঠিক যেন কেউ এসে report দিচ্ছে।[৫২]

শ্রীম পরবর্তী কালে তাঁর কাছে সমবেত ভক্তদের শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময়ী কথার মণিমুক্তো উপহার দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেছেন—খুব ভালো background তৈরি করে এসব কথা অপরকে দিতে হয়, নইলে দাম কমে যায়। যেমন ডায়মণ্ড মাটিতে রাখুন একরকম দেখাবে, ঘাসের ওপর রাখলে অন্যরূপ দেখাবে। কাঠে রাখলে আর একরকম। কিন্তু ভেলভেটের ওপর রাখলে তার brilliance সব চাইতে বেশি বাড়ে।[৫৩]

পূর্বোক্ত সূত্র ধরেই ভক্তদের কাছে চিঠি লেখার ক্ষেত্রে শ্রীম বলতেন—চিঠিটা পড়েই পাঠকের মনে হওয়া চাই, ঈশ্বরই আমাদের অনন্তকালের বন্ধু। অন্য সব দুদিনের। তাতে থাকবে সুন্দর বর্ণনা— স্থান—কাল—পাত্রের সহিত। কবিত্বও চাই। এসব রস আস্বাদন না করলে মন একেবারে ব্রহ্মরসে যেতে চায় না। তাই ছিটেফোঁটা এও চাই—যতদিন না সমাধি হচ্ছে।[৫৪]

ছিটেফোঁটা কাব্যরসের সঙ্গে মিশিয়ে ব্রহ্মরস পরিবেশনের কলাকৌশল শ্রীম'র আয়ত্ত ছিল তাই 'কথামৃতে'র পাতায় পাতায় কবি শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য প্রসঙ্গের কথাকাব্য ও ব্রহ্মরস তাঁর উপযুক্ত শিষ্য শ্রীম'র যোগ্য উপস্থাপনায় অনুপম, অনবদ্য, তুলনারহিত।

রামচন্দ্র দত্তের প্রেরণায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা এবার ধারাবাহিকভাবে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম কথিত'—এই নামে 'তত্ত্বমঞ্জরী', 'বঙ্গদর্শন', 'উদ্বোধন', 'হিন্দুপত্রিকা' প্রভৃতি তৎকালীন প্রচারিত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল। পরে এইসব রচনা একত্র করে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ উদ্বোধন প্রেস থেকে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম কথিত: প্রথম ভাগ' প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে।[৫৫]

বাংলায় 'কথামৃতে'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (যথাক্রমে ১৯০২ ও ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে) প্রকাশের পর ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজি 'গসপেল' প্রকাশ করেন শ্রীম। এটি প্রথম 'ব্রহ্মবাদিন' অফিস থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইটির শীর্ষক ছিল 'The Gospel of Sri Ramakrishna [according to M (Mahendra) a son of the Lord and Disciple], OR the Ideal Man for India and the World.' বইটির পৃষ্ঠা—সংখ্যা ছিল তিনশো চুরাশি এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ছিল ইংরেজি বাইবেলের মতো ক্রিয়ারূপ।

এখানে উল্লেখ্য যে, 'গসপেল' কিন্তু 'কথামৃত' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের অনুবাদ নয়। এটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ—ইংরেজিতে শ্রীরামকৃষ্ণকথার মৌলিক প্রকাশন।

'গসপেল' প্রকাশের পর শ্রীম ১৯০৮ ও ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে যথাক্রমে 'কথামৃত'—এর তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগ প্রকাশ করলেন। চতুর্থ ভাগ 'কথামৃত' রচনা প্রসঙ্গে গোকুলদাস দে নামে শ্রীম'র এক ভক্ত জানিয়েছেন, "(১৯১০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের) অল্প দিন পরে সকালের দিকে (একদিন মর্টন স্কুলে) গিয়ে দেখি তিনি (শ্রীম) অতি শুদ্ধাচারে বসে ও একটি যুবক ভক্তকে কাছে বসিয়ে চতুর্থ ভাগ কথামৃতের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করাচ্ছেন। ছোট ছোট অক্ষরে লেখা কতকগুলি পুরোনো কাগজ সামনে ধরেছেন এবং তা দেখে বলে যাচ্ছেন ও লেখক লিখছেন; গানগুলি গেয়ে শোনাচ্ছেন। আর কত ভাগ 'কথামৃত' হতে পারে জিজ্ঞেস করায় শ্রীম বললেন, 'তাঁর ইচ্ছায় এখনও আট—দশ ভাগ হতে পারে'। প্রথম থেকে চতুর্থ ভাগ পর্যন্ত প্রতিটি গ্রন্থেরই বৈশিষ্ট্য হল, ঘটনার বিবরণ ১৮৮২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৮৬—এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত বিভিন্ন দিনের। পুনরাবৃত্তি নেই, আবার ধারাবাহিকতাও নেই। একাদিক্রমে পরপর কদিন যদি শ্রীম ঠাকুরের সঙ্গ করে থাকেন, তার একেক দিনের বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে সঞ্চারিত। কোথাও কোথাও শ্রীম উল্লেখ করেছেন, পূর্বদিনের বিবরণ পূর্ববর্তী কোন ভাগে আছে।

এরপর 'গসপেল'—এর দ্বিতীয় সংস্করণ মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রকাশিত হল ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে। এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথম সংস্করণের নামকরণ থেকে '(Mahendra)' এবং 'OR the Ideal Man

for India and the World' অংশ দুটি বাদ দেওয়া হয়। তাছাড়া, বাইবেল অনুসারী ক্রিয়াপদগুলির পরিবর্তন করে প্রচলিত ক্রিয়াপদই ব্যবহার করা হয়। এই পরিবর্তন, প্রকাশক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ শ্রীম'র অনুমতি নিয়েই করেছিলেন। বিশেষ জনপ্রিয়তার জন্য এই বইটির অনেকগুলি সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ মাদ্রাজ মঠ থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল।

'গসপেল'—এর একটি মার্কিন সংস্করণ নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি প্রকাশ করে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দেই। এই বইটির শীর্ষক ছিল—'The Gospel of Sri Ramakrishna'. স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই বইটির সম্পাদনা করেছিলেন এবং বইটির ওপর স্পষ্ট লেখা ছিল—'Authorised Edition'. এর ভূমিকায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখেছেন, "শ্রীম 'কথামৃত'র যে ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন তার পাণ্ডুলিপি আমাকে প্রেরণ করেন এবং ওই অনুবাদের সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব আমাকে দিয়ে পত্র লেখেন।

"শ্রীম'র অনুরোধে ওই ইংরেজি পাণ্ডুলিপির বড় অংশের সম্পাদনা আমি করেছি, পুনর্বিন্যাসও করেছি; বাকি অংশ সরাসরি বাংলা বই থেকে অনুবাদ করে নিয়েছি।... বর্তমান সংস্করণের প্রতিশব্দকে আমি যথাসম্ভব মূলানুগ, সরল ও মৌখিক ভঙ্গির রাখতে চেষ্টা করেছি।"

এই বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল চারশো ছত্রিশ। বইটি আমেরিকায় যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল। কেবল তা—ই নয়, স্প্যানিশ, পোর্তুগীজ, ড্যানিশ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান এবং চেকোস্লোভাক ভাষায় এই বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। বিদেশী ভাষা ছাড়াও 'কথামৃত' বহু ভারতীয় ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে।

বাংলাভাষী ছাড়াও অন্যান্য ভারতীয় এবং বিদেশী ভাষাভাষী, শ্রীরামকৃষ্ণভক্তেরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং 'The Gospel of Sri Ramakrishna'—কে তাঁদের প্রাণের জিনিস করে নিয়েছেন। এমনকি 'গসপেল' পড়ে কিছু কিছু ভক্ত এতদূর অনুপ্রাণিত হয়েছেন যে, তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের ভাষায় মূল বাংলা 'কথামৃত' পড়ার উদ্যোগও গ্রহণ করেছেন।

শ্রীমকে ঠাকুর যে জগদম্বার 'একটু' কাজ করে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, জীবনের শেষ পর্বে শ্রীম দিবারাত্রি তা অসামান্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। সমবেত ভক্ত, ব্রহ্মচারী, সাধুদের সঙ্গে তিনি অনর্গল ভগবৎপ্রসঙ্গ আর শ্রীরামকৃষ্ণকথা বলতেন। উপনিষদ ছিল শ্রীম'র প্রাণ; তারপরই ছিল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। এছাড়া, বাইবেলের দুই টেস্টামেণ্টই ছিল তাঁর নখদর্পণে। খ্রীস্ট—ভক্তেরাও যীশুখ্রীস্টের প্রতি শ্রীম'র ভক্তি, প্রীতি ও ভালোবাসা দেখে মুগ্ধ হতেন। শ্রীম বলতেন: আমরা ক্রাইস্টের (অর্থাৎ ঠাকুরের) সঙ্গে ঘর করেছিলাম কিনা, তাই তাঁর কথা একটু একটু বুঝতে পারি।[৫৬]

শেষজীবনে শ্রীম সংসারে নামমাত্র থাকতেন। থাকতেন কখনও ৫০ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের স্কুল বাড়িতে, আবার কখনও বা গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের পৈত্রিক ভিটেতে। এখানে দোতলার সিঁড়ির পাশের ঘরটিতে থাকতেন। সেই ঘরেই ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসগুলি থাকত। সেগুলি আজও যথাযথভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে। শ্রীম যেখানেই থাকুন, সর্বদা সাধু—ভক্তে পরিবৃত হয়ে থাকতেন।

এই জীবনযাত্রায় দৈবাৎ কখনও স্কুলের কিছু কাজ—কর্ম দেখতে হত। অনুক্ষণ ভগবৎপ্রসঙ্গ তো তিনি করতেনই, তা ভিন্ন 'কথামৃত' চারটি ভাগের সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ কর্মেও তিনি ব্যাপৃত থাকতেন। এর মূল কাজটি ছিল প্রুফ দেখা। তঁর কাছে যেসব তরুণ ভক্ত—ব্রহ্মচারী থাকতেন, তাঁরা তাঁকে এই কাজে সহায়তা করতেন। আর তিনি তাঁদের সাধুজীবন গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিনে বেলুড় মঠে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ শ্রীমকে বলেছিলেন: মাস্টারমশাই, ঠাকুরও এক আর (তাঁর) 'কথামৃত' লিখবার লোকও এক। আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি, স্বামীজির কথার চেয়ে আপনার কথায় ছেলেদের কাজ হচ্ছে বেশি, আর ভালোও লাগে। তাই বলি, 'কথামৃত' একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা! কী অপূর্ব গ্রন্থ

রচনা করেছেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম, মঠের চোদ্দো আনা লোক সাধু হয়েছে 'কথামৃত' পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।[৫৭]

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম দিককার বেশিরভাগ সন্ন্যাসীই শ্রীম'র সঙ্গ ক'রে তাঁরই প্রেরণায় সাধুজীবন গ্রহণ করেছিলেন। সাধু এবং সাধু—জীবনের প্রতি শ্রীম এমনই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, তাঁর সন্তানতুল্য নবীন ব্রহ্মচারীরা গেরুয়া ধারণ করলে তাঁদের তিনি আর তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিতেন না। নবীন সন্ন্যাসীদের ত্রুটি—বিচ্যুতির কথা কেউ বললে শ্রীম তখনই প্রতিবাদ করে বলতেন: দোষে—গুণে মানুষ। সাধুর দোষ থাকলেও তাঁরা আমাদের প্রণম্য। তাঁদের নিন্দা করলে আমরা কার কাছে ঈশ্বরীয় কথা শুনব?[৫৮]

শ্রীম—সাধুর আশ্রম আর সাধু! সাধু কী কম গা! সংসারী ভক্ত ও সাধুভক্ত এদের মধ্যে কত তফাৎ! তিনি (ঠাকুর) কী বলতেন জানো? বলতেন, যেন সুমেরু পর্বত ও সরষে। ব্রহ্মচারি—সন্ন্যাসী—'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি।' আবার ব্রহ্মচারীর কর্তব্য 'অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ'। এই এঁরা (তাঁর কাছে উপস্থিত সাধুদের লক্ষ্য করে) পারেন তাঁর চিন্তা করতে—whole-time man. সংসারীকে টাকার চেষ্টা, আরও কত কী করতে হয়। তাই সাধু এত বড়। শ্রীভগবান এই সাধুদের জন্য অবতার হয়ে আসেন... এঁরা in the world, but not of the world. সংসার এঁদের claim করতে পারে না, কর্তব্য বাঁধতে পারে না।[৫৯]

শ্রীম'র প্রেরণায় ধর্ম ও সাধুজীবন গ্রহণকারী স্বামী ধর্মেশানন্দ মহারাজকে শ্রীম বলেছিলেন: রাতদিন তাঁর কাছে প্রার্থনা, যেন উদ্দেশ্য না ভুল হয়ে যায়। রেখে দাও তোমার duty (কর্তব্য)! ও যারা ভাবার তারা ভাবুক গে! যো সো করে তাঁকে (তাঁর) দেখা পাওয়া চাই। তাই তাঁকে কেবল প্রার্থনা। আর তাই এই বহিঃসন্ন্যাস। অন্তঃসন্ন্যাস না হলে ঈশ্বরদর্শন হয় না। কিন্তু আবার এই বহিঃসন্ন্যাস না হলে অন্তঃসন্ন্যাস হয় না। দু—এক জন exception থাকতে পারেন—যেমন জনকাদি; কিন্তু সাধারণ নিয়ম এই। এই যে হোমাদি ক'রে, মন্ত্রপাঠ ক'রে বহিঃসন্ন্যাস—ও দরকার। ওই তো আরম্ভ। বাহিরের struggle শেষ ওখানে। অন্তরের struggle হচ্ছে মনকে অন্তর্মুখী করানো। সর্বদা প্রার্থনা করা—মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ কোরো না।[৬০]

শ্রীম'র জীবনের মূলমন্ত্রই হল সাধুসঙ্গ। সকল ভক্তকেই তিনি সাধুসঙ্গ করতে উপদেশ দিতেন। এই প্রসঙ্গেই ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯ তারিখে এক ভক্তকে (রমেশচন্দ্র সরকার) বলছেন: আমাদের সাধুসঙ্গ বড় দরকার। আমার ইচ্ছে ছিল শ্রীশ্রীঠাকুর যেসব জায়গায় গিয়েছিলেন যেসব জায়গায় যাই, সাধুসঙ্গ করি; ইচ্ছা ছিল দক্ষিণেশ্বরে যাই; কিন্তু বুড়ো হয়ে গেছি। হাঁটতে পারি না। কী করি! তবে সাধুদের ধ্যান করি। সাধুদের ধ্যান করলে নাকি সাধুসঙ্গ হয়। সাধুদর্শন করে এসে সাধুদের ধ্যান করতে হয়। আর যদি সাধুদের রাজা অবতারের ধ্যান করা হয় তবে তো কথাই নেই। পরমহংসদেব অবতার। অবতারের ধ্যান ব্যতীত ভগবানকে ধরার জো নেই।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন শ্রীম'র প্রাণের প্রাণ। তিনি অহোরাত্র যেন শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যেই কাটাতেন। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে পুরীবাস কালে স্বামী দেশিকানন্দ মহারাজের কাছে ঠাকুরের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে শ্রীম বলেছিলেন: আমি যখন আপনাকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করছিলাম, তখন সঙ্গে সঙ্গে দর্শন করছিলাম দীর্ঘকাল পূর্বে সভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অনুষ্ঠিত দেব—দৃশ্যাবলী। কালের ব্যবধান ভেদ করে ওই দিব্যলীলা আমার চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত—সাক্ষাৎ ও জীবন্ত! তাতেই আমি বিহ্বল হয়ে যাই। আবেগ সামলাতে না পেরে শ্রীভগবানের অমানবীয় করুণা আর এই দিব্য দর্শনের জন্য আমার মন প্রাণ কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে পড়ে।[৬১]

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীম'র এ—যাবৎ অপ্রকাশিত ঠাকুরের কথাগুলি প্রকাশের ইচ্ছা প্রবল হল। তাই তারই কিছু কিছু লিখে চার—পাঁচ মাসে ধরে 'বসুমতী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবর্তক', 'বঙ্গবাণী', 'উদ্বোধন' প্রভৃতি মাসিক পত্রে তিনি প্রকাশ করলেন। এই রচনাগুলিই সঙ্কলিত হয়ে পরে 'কথামৃত' পঞ্চম ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শ্রীম'র সমগ্র জীবন নিরন্তর সাধনার জীবন। তিনি প্রায়ই নিজের মধ্যে নিরাশ্রয় পথিকের ভাব আরোপ করতেন। এইজন্যই জীবনের শেষ পর্বে মাঝে মাঝেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলের চাতালে বা তার নিচের ফুটপাতে রাত্রি—বাস করতেন সামাজিক পরিচয়হীন বাস্তুহারাদের সঙ্গে।[৬২] সানের মেঝেতে বালিশের বিকল্প হিসাবে ভাঁজ করা হাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। একভাবে হাত ভাঁজ করে থাকার ফলে হাতের কনুইতে মাঝে মাঝে যন্ত্রণা হত। ক্রমে তা শূল বেদনায় (নিউরালজিয়ার ব্যথায়) পরিণত হয়। শ্রীম প্রায়ই এতে কষ্ট পেতেন। একটু—আধটু গরম সেঁক দিতে দিতে ধীরে ধীরে তার উপশম হত। কিন্তু তিনি পারতপক্ষে কখনই কারও সেবা নিতেন না। নিজেই নুনের পুঁটলি গরম করে সেঁক দিতেন। কিন্তু ১৫ অক্টোবর, ১৯৩০ তারিখে এই বেদনায় প্রায় তিন ঘণ্টা একটানা অসহ্য কষ্ট ভোগ করেন। তখন বাড়ির লোকজন এবং ভক্তেরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর সেবা করেন। তার ফলে ক্রমশ আরাম বোধ হওয়ায় ধীরে ধীরে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।[৬৩]

পরে শ্রীম তাঁর অসুস্থার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, একবার তাঁর জ্বর হলে, কিছুতেই জ্বর ছাড়ছে না দেখে ডাক্তার তাঁকে কথা বলতে, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতেও নিষেধ করেন। কিন্তু তবুও একমাসের ওপর জ্বর ছাড়ে না। শেষে নিরুপায় হয়ে ডাক্তার তাঁকে কথা বলতে দিতে রাজি হলেন। ঈশ্বরীয় কথা বলতে বলতে ক্রমশ তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল।[৬৪] এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন: যে—কথা প্রাণ, তা না বললে বা শুনলে নাড়ী আসবে কী করে? এই এক ডিপার্টমেণ্ট ভগবানের। যাঁরা এখানকার লোক, তারা তাঁর কথা না বলে বা শুনে থাকে কী নিয়ে, মরে যাবে যে![৬৫]

* * *

২০ অক্টোবর, ১৯৩০। নিউরালজিয়ার ব্যথায় শ্রীম আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে সেবক—ভক্তদের বলছেন: দেখছি এই অসুখের কত কষ্ট, বেদনাটা (নিউরালজিয়ার) বাড়ে সময়ে। ও মা, এরই মধ্যে যেন তাঁর (ঠাকুরের) সেই কঙ্কালসার শরীরের কথা মনে হয়। অমনি লজ্জা হয়, আমরা এইটুকু সইতে পারি না। আর তিনি এই স্কেলিটনে (কঙ্কালে) কী কাণ্ড—কারখানা করে গেলেন—কত কথা! সমাধি, মুহুর্মুহু সমাধি চলছে।

অসুস্থ শ্রীম'র দেখাশোনার সুবিধের জন্য মর্টন ইনস্টিটিউশানের তিন তলার যে—অংশে তাঁর পরিবার—পরিজন থাকেন সেখানে তাঁকে নামিয়ে আনা হল। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় শ্রীম স্ত্রী—পুত্র—কন্যাদের দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। তাঁদের প্রতি ব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণ নির্মোহ। তাঁদের যা অধিকার তা তাঁদের দেন। কিন্তু পরমার্থ সম্বন্ধে সাধু—ভক্তরাই তাঁর বন্ধু, সুহৃদ, পরিজন ও আপনজন। তাঁদের তিনি পরমাত্মীয় মনে করেন। এই অসুখেও সাধু ও ভক্তেরাই সর্বদা তাঁর সেবা ও শুশ্রূষা করেছেন।

স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক। শ্রীম অসুস্থ শুনে তাঁকে দেখতে এসেছেন। এসেই তিনি শ্রীম'র দুই বাহু ও পিঠ টিপে দিতে শুরু করলেন। শ্রীম এটি অন্যদের করতে দেন না। কিন্তু ইনি তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন বলেই তাঁকে শ্রীম এই সুযোগটুকু দিলেন।[৬৬]

দুর্বিষহ শূল বেদনা প্রসঙ্গে শ্রীম বলছেন, ''বেদনায় সব কিছু ভুলে যাই, মনে থাকে না। এখন কেবল ঠাকুর ও তাঁর 'কথামৃত' মনে থাকে। নাম—রূপ সব ভুল হয়ে যাচ্ছে।'' কষ্ট খুব বাড়লে কখনও 'কথামৃত' (পঞ্চম ভাগ?) লিখতে বসেন। বারণ করলে বলেন, ''না ঠাকুরের 'কথামৃতে'র চিন্তায়, তাঁর আনন্দে বেদনা ভুল হয়ে যায়।''[৬৭]

রোগ—যন্ত্রণা প্রসঙ্গে শ্রীম একদিন মর্টন ইনস্টিটিউশানের ছাদে সমবেত ভক্তদের বলেছিলেন, ''ভাগ্যিস আমরা ঠাকুরকে দেখেছিলাম। তাই একটু glimpse (আভাস) পাওয়া যাচ্ছে কী করে তিনি ভক্তদের অত

কর্মফল তাঁর দেহে ভোগ করলেন অম্লান বদনে। দেহের তো অত কষ্ট, যাকে যমযন্ত্রণা বলে, তেমনি কষ্ট। কিন্তু এরই ভিতর দেহ ছেড়ে মন ব্রহ্মে লীন। মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়।

"স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ—এই চারটে ভাগ আছে শরীরের। স্থূলেরই অসুখ। মনটি এমনি তৈরি স্থূল থেকে ফস করে মহাকারণে নিয়ে যান। সেখানে পরমানন্দ। ওতে মনটাকে রসিয়ে রাঙ্গিয়ে নিচে নিয়ে এলেন। 'উঃ, উঃ' করছেন, একটু পর কিন্তু মনে দুঃখের অভিনিবেশ নেই। প্রায় যুগপৎ দুঃখবোধ ও সমাধির আনন্দ। এ মানুষে সম্ভব নয়। তাই ওই সব ঠাকুরের আচরণ চিন্তা করলে সংসারের দারুণ দুঃখ সহ্য করা সম্ভব হয়। দুটি contradictory (বিরুদ্ধ) ভাব যুগপৎ অবতারেই সম্ভব। চোখে দেখেছি যে—এক সঙ্গে আলো ও আঁধার, রোগযন্ত্রণা ও পরমানন্দ।"[৬৮]

ঠাকুরকে শ্রীম কী চোখে দেখতেন?—১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের এক বিকেলে মর্টন ইনস্টিটিউশানের ছাদে সমবেত ভক্তদের শ্রীম বলছেন, "প্রথম যখন তাঁর দর্শন পাই, মনে হল যেন সাধারণ মানুষ। তারপর যত দিন যেতে লাগল, দেখি—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, মায়ার আবরণে যেন ঢাকা, আমাদের মনের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

"তিনি বেদবিধির পার। কৃপা করে শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাই। তিনি চলে গেছেন কত বৎসর হয়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মনে হয়—এসব ঘটনা যেন কাল হয়ে গেছে। তিনিই সব। ... এখন বেশ দেখতে পাচ্ছি, তিনি হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, আর শেষটুকু তিনিই নিয়ে যাবেন।"[৬৯]

আবার অন্যত্র শ্রীম বলছেন: আমরা ধন্য! তাঁর সঙ্গে ঘর করেছি। তাঁকে ভালোবেসেছি, তাঁর স্নেহ লাভ করেছি; নিজ হাতে তাঁর চরণ ধরেছি, তাঁর প্রসাদ খেয়েছি, চক্ষুতে তাঁকে দর্শন করেছি, কানে তাঁর কথা শ্রবণ করেছি, তাঁর কৃপায় তাঁর সাকার—নিরাকার রূপ দর্শন করেছি, মৃত মানুষ অমৃত হয়েছি, ভয়গ্রস্ত অভয়প্রাপ্ত হয়েছি, আমরা ধন্য! (ভক্তদের প্রতি) তোমরাও ধন্য—তাঁর কথা শুনে, না দেখে তাঁকে ভালোবেসেছ। তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে পথে দাঁড়িয়েছ। তাঁর ভক্ত যারা ঘরে আছে তারা কেউ সংসারী নয়—ঠাকুর এই কথা বলেছিলেন।[৭০]

একদিন এক ভক্ত শ্রীমকে অনুরোধ করলেন, "ঠাকুর দেখতে কেমন ছিলেন, আপনি একটু বর্ণনা করুন।"

শ্রীম মৃদু হেসে বললেন, "সাধ্যাতীত।" তারপর আবার বললেন, "রাজা মহারাজ, রামলালদাদাকে দর্শন করেছেন?"

ভক্ত: "হ্যাঁ।"।

শ্রীম: "তবে তিনি কী রূপ ছিলেন তার আভাস পেয়েছেন। ধ্যান করুন, জানতে পারবেন। আর তাঁর সকল ভক্তের চোখে মুখেই তাঁর ছাপ একটু আধটু আছে, 'তদ্ভাবভাবিত তদাকারাকারিত' কিনা; কী বলেন?"[৭১]

স্বামী ধর্মেশানন্দ মহারাজকে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের এক দুপুরে শ্রীম বলেছিলেন, "ধীরেন, বেদ—বেদান্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলেই পড়ে আছে। সেই চরণ ধ্যান করলে সমস্ত জ্ঞান লাভ হয়।"[৭২]

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে একটি শতবার্ষিকী গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেয় বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ, উৎসবের বেশ কয়েক বছর আগে। এর প্রধান উদ্যোক্তা স্বামী অবিনাশানন্দ মহারাজ এ—ব্যাপারে পরামর্শের জন্য শ্রীম'র কাছে হাজির হলে শ্রীম তাঁকে বলেন, "ধর্মের প্রাণ তপস্যা। ঠাকুর সেই তপোমূর্তি ছিলেন। যদি তোমরা ভারতবর্ষে নানা স্থানে ভ্রমণ করে ভগবানের জন্য সর্বত্যাগী তপস্বীদের অভিজ্ঞতার লিপি সংগ্রহ করতে পার, তাহলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বোৎকৃষ্ট স্মৃতিগ্রন্থ হবে। স্বামীজি, রাজা মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসিশিষ্যগণের তপস্যার ওপরই এই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত।"[৭৩] শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বর এবং স্বামীজীদের তপোভূমি বেলুড় মঠ, এই দুটি জায়গাকেই শ্রীম সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলে

মনে করতেন। এই দুই জায়গা থেকে কোনও ভক্ত সোজাসুজি তাঁর কাছে এলেই তিনি সমস্ত কথা বন্ধ রেখে তাঁদের কাছে বসিয়ে বলতেন: আহা! ধন্য তোমরা, ওখান থেকে আসছ। আমি অসমর্থ, যেতে পারি না, তোমাদের সঙ্গ করে ধন্য হই।[৭৪]

বেলুড় মঠ প্রসঙ্গে এক ভক্তকে (শান্তিকুমার মিত্র) শ্রীম বলছেন: যতদিন এই সঙ্ঘে একটিমাত্র খাঁটি সাধু থাকবেন ততদিন তিনিই এই সঙ্ঘশরীরে থেকে সঙ্ঘ চালাবেন। ... দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ত্রিশ বৎসর বাস করে গেলেন। বেলুড় মঠে স্বামীজী দেহ রাখলেন। ওখানে কত সাধনভজন হয়েছে। ওসব মহাতীর্থ স্থান। ওসব স্থানে মন সহজে ভগবন্মুখী হয়।[৭৫]

শ্রীম'র শরীর ভালো যাচ্ছে না। তাই বেলুড় মঠ থেকে স্বামী ধর্মেশানন্দ প্রমুখ কয়েকজন সাধু ১৪ জানুয়ারি, ১৯৩১ তারিখে মর্টন ইনস্টিটিউশনে শ্রীমকে দেখতে এসেছেন। শ্রীম'র প্রতি—

ধর্মেশানন্দ—আপনার শরীর ভালো আছে?

শ্রীম—চলে যাচ্ছে, তবে দুর্বল।

ধর্মেশানন্দ—কথা বলতে কষ্ট হয় না?

শ্রীম—এই সাধুদের সঙ্গে কথা বললে বরং energy পাই। সাধারণ গৃহস্থদের সঙ্গে কথা কইলে কষ্ট হয়।[৭৬]

১৬ জানুয়ারি, ১৯৩১। অসুস্থ শ্রীমকে দেখে সাধুরা বিদায় নিতে চাইলে শ্রীম তাঁদের প্রসাদ দিতে বললেন। কেউ কেউ তিনতলায় অসুস্থ শ্রীম'র ঘরের বাইরে প্রসাদ গ্রহণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে শ্রীম বললেন—না গো, এখানে (আমার সামনে) সব বসে খাও। এ যে নরনারায়ণ সেবা। হিন্দুর জীবন একটা continual worship... সাধুরা সব খান আর ভাবেন ভিতরে নারায়ণ রয়েছেন, তাঁকে পুজো করছি।

প্রসাদ গ্রহণ শেষ হলে উপস্থিত অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে থেকে একজন (হিমাংশু), শ্রীম বেশি কথা বললে তাঁর যন্ত্রণা বাড়বে মনে করে তাঁকে বললেন, "আমরা উপরে (চারতলায়) গিয়ে কথা কই?"—এর উত্তরে শ্রীম তাঁকে বললেন, "কথা কয়ে কী হবে! তার কি বেশি প্রয়োজন? তার চেয়ে চুপ করে বসে থাকা—চিন্তা ধ্যান করা গুরুমূর্তির। গুরু সামনে উপবিষ্ট, এক হাতে করুণা ও অভয়মুদ্রা, অপর হাতে তত্ত্বমুদ্রা, স্থিরনেত্র—ধ্যানস্থ—এই কেবল চিন্তা। কথা কী করতে! মীমাংসা তো হয়ে গেছে। এখন কেবল চিন্তা। কী বলো?"[৭৭]

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন। শ্রীম উত্তেজিতভাবে স্বামীজীর কথা শোনাচ্ছিলেন ভক্তদের, হঠাৎ শূল—বেদনা শুরু হল। শ্রীম উঠে ঘরের ভিতরে গিয়ে বিছানায় ছটফট করতে লাগলেন। সেখানে হাজির সাধুরা নানাভাবে সেবা করতে লাগলেন।

শ্রীম, ১৩৩৮ (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) সালের শ্রাবণ মাস থেকে আবার 'কথামৃত' পঞ্চম ভাগ লেখা শেষ করার সঙ্কল্প করলেন। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত খণ্ডগুলি একত্র করে তাতে কিছু নতুন কথা সংযোজন করে পঞ্চম ভাগ প্রকাশ করবেন স্থির হয়। ছাপার কাজও আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু লেখা আর আরম্ভ করতে পারছিলেন না। শরীর দুর্বল, বেদনা লেগেই আছে। এই অবস্থায় তিনি ৫০ নং আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের 'ঠাকুরবাড়ি' (পৈতৃক ভবন)—তে চলে এলেন। শ্রীম যখনই 'কথামৃত' বই আকারে লেখা আরম্ভ করতেন তখনই তিনি শুদ্ধাচারে একাহারী ও হবিষ্যাশী হয়ে দিন কাটাতেন— যতদিন না সম্পূর্ণ বইয়ের কপি তৈরি হত, ততদিন তিনি এই ব্রতপালন করতেন। এবার ঠাকুরবাড়িতে এসেও সেইভাবেই দিন কাটাতে লাগলেন। কিছু কিছু লেখাও হতে লাগল। মাঝে মাঝেই হাতের ব্যথায় কষ্ট পান, কিন্তু তবুও হাসিমুখে এখানেই ভক্তদের সঙ্গদান করেন।[৭৮]

এখন শ্রীম কখনও স্কুলবাড়িতে থাকেন আবার কখনও ঠাকুরবাড়িতে থাকেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম পাদ। শ্রীম স্কুলবাড়িতে আছেন। সন্ধ্যা। শ্রীম'র অপরিচিত একটি যুবক (শৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়) তাঁকে দেখতে এসেছেন। স্কুলবাড়ির ছাদের একপাশে একটা তক্তাপোশ পাতা। তাতে কয়েকজন ভক্ত বসে আছেন; তাঁদের অনুমতি নিয়ে তিনি তক্তাপোশের একপাশে বসলেন। দোতলা থেকে ধীরপদে ছাদে উঠে

শ্রীম তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসলে একটি ছেলে (শ্রীম'র পুত্র) লাল শালুতে মোড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এনে তাঁর হাতে দিলেন। শ্রীম সেই বই মাথায় ছুঁইয়ে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হলেন। তার পর একখণ্ড 'কথামৃত' বার করে অপরিচিত যুবকটির হাতে দিয়ে বললেন, ''আজ আপনি ভাগবত, আমাদের 'কথামৃত' পাঠ করে শোনাবেন।''

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে পাঠ চলল। সারাক্ষণ শ্রীম'র দুই চোখে প্রেমাশ্রু প্রবাহ। পাঠ সাঙ্গ হলে শ্রীম অশ্রু সংবরণ করে শান্ত হলেন। যুবকটি তাঁকে প্রণাম করার চেষ্টা করতেই তাঁকে বারণ করলেন। বললেন, ''আপনি ভাগবত।'' তারপর বইটি শালু জড়িয়ে রাখতে রাখতে আপন মনে ভাবস্থ হয়ে বললেন, ''এটি পঞ্চম বেদ। এর প্রতিটি কথা মন্ত্র। মানুষের চৈতন্য হয়, মনে শান্তি আনে, সংসারজ্বালা জুড়ায়।''[৭৯]

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের মে মাস। শ্রীম এখন ঠাকুরবাড়িতে বাস করছেন। পঞ্চম ভাগ 'কথামৃত' রচনা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা চলছে। সেইসঙ্গে চলছে প্রুফ দেখার কাজও।

ঠাকুরবাড়ির দোতলার ছোট ঘরটিতে শ্রীম মাদুরের উপর বসা। পাশেই খাট—বিছানা। শরীরের এই কষ্ট। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, তবু পঞ্চম ভাগ 'কথামৃতে'র কাজ করে যাচ্ছেন নিবিষ্ট মনে।

পরের দিন ১৫ মে, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ। শ্রীম'র ঠাকুরবাড়িতে কিছু মেরামতির কাজ হচ্ছে। তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েই বারবার উপর—নিচ করছেন। খুঁটিনাটি সব দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছেন। দুর্বল, শীর্ণ শরীর, কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কাজের তদারকি করতে করতেই একসময় শ্রীম গান ধরলেন—

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।।
সারাৎসার তারা নাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা বলে যাত্রা
করে বসে আছি।।

এখজন ভক্ত—সেবক শ্রীম'র কণ্ঠে এই গান শুনে ভাবছেন, তবে কি শ্রীম'র স্থূল শরীরে থাকার দিন ফুরিয়ে এল?

কদিন পরে ভক্তটিকে শ্রীম বললেন, ''এখন তিনি (ঠাকুর) বলছেন, 'বসে বসে তাঁর নাম করো'।''

ভক্ত—তাহলে কেন কাজ করেন?

শ্রীম—'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি।'[৮০]

শ্রীম কষ্ট করে রাত জেগে 'কথামৃত'—র প্রুফ দেখছেন, ঠাকুরবাড়িতে কয়েকদিন থেকে। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ তাই দেখে একদিন সশ্রদ্ধ তিরস্কার করলে স্নেহের শাসন মেনে নিয়ে শ্রীম তাঁকে বললেন, ''এই বই পড়ে লোকের শান্তি হচ্ছে—ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা। শরীর তো যাবেই। তাঁর কথায় যদি লোকের শান্তি হয় তাহলে এভাবে যাওয়াই উত্তম। আমরা সংসারে রয়েছি, এর কী জ্বালা, কী দুঃখ হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। সে—জ্বালা ভুলেছি তাঁর 'কথামৃতে'। সেই 'কথামৃত' দুঃখ—সন্তাপে ক্লিষ্ট জগতের লোকদের দেবার চেষ্টা হচ্ছে। বইটা তাড়াতাড়ি বের হলে ভালো হয়, তাই এই কাজ।''[৮১]

২৫ মে, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ। শ্রীম ঠাকুরবাড়ির দোতলার পশ্চিমের ছোট ঘরে বসে পঞ্চম ভাগ 'কথামৃত'—র অন্তিম পরিশিষ্ট 'চ' লেখা আরম্ভ করেছেন। লিখতে লিখতে শ্রীম'র হাতের বেদনা আরম্ভ হল। আজকাল মন বেশি একাগ্র করলেই ব্যাথাটা বাড়ে। ঘরের মধ্যে খগেন ডাক্তার, স্বামী রাঘবানন্দ ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ উপস্থিত আছেন। নিত্যাত্মানন্দ মহারাজ শ্রীম'র মাথায় হাওয়া করতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলেন, সেঁক দেওয়ার দরকার আছে কিনা। শ্রীম জানালেন, ''না, শুয়ে পড়লেই সেরে যাবে।''

২ জুন, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, রাত একটা পর্যন্ত জেগে শ্রীম 'কথামৃত' পঞ্চম ভাগের শেষ ফর্মার লেখা শেষ করলেন। তার কোথাও কোথাও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করলেন।

৩ জুন, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার। সকালবেলা শ্রীম 'ঠাকুরবাড়ি' থেকে স্কুল বাড়িতে এলেন। ইদানীং চারতলায় উঠতে কষ্ট হয়। তাই একতলার একটি ঘরে থাকবেন বলে মনস্থ করেছেন। একতলার ঘরগুলো গ্রীষ্মকালেও ঠাণ্ডা থাকে। শ্রীম একতলার একটি ঘর তাঁর প্রয়োজনমতো গোছগাছ করিয়ে নিচ্ছেন।

দুপুরবেলা শ্রীম ঠাকুরবাড়ি ফিরে গেলেন। আবার বিকালে স্কুলেবাড়িতে এলেন এবং প্রায় তিন ঘণ্টা সেখানে রইলেন। ওপরে ছাদের ঘর—ওখানে খুব হাওয়া। এরপর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ দৌহিত্র হুলোকে সঙ্গে নিয়ে 'ঠাকুরবাড়ি' ফিরে চললেন, হেঁটে। পথে সিটি কলেজের কাছে ক্লান্ত হয়ে একবার পথেই বসে পড়লেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে অতিকষ্টে হেঁটেই ঠাকুরবাড়িতে এলেন। ঠাকুরবাড়িতে তখন ঠাকুরদের আরতি আরম্ভ হয়েছে। শ্রীম তিনতলায় হাজির হয়ে প্রণাম করে নিজের ঘরে দোতলায় ফিরে গেলেন।

আজ রাত্রে ফলহারিণী কালীপূজা। স্বামী রাঘবানন্দ ও সতীনাথ, এই দুজন ভক্তকে শ্রীম ভবানীপুরে গদাধর আশ্রমে পূজা দেখতে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, "ওখানে সারারাত কালীপূজা হবে—আবার (কাছেই) মুক্তিক্ষেত্র কালীঘাট। খুব দিন আজ; এই এক রাতে হাজার বছরের তপস্যা হয়ে যায়।"

ওঁরা চলে গেলে শ্রীম আরেকবার তিনতলায় উঠলেন। দেখলেন ব্রহ্মচারী বলাই ঠাকুরকে শয়ন দিচ্ছেন। তখন তিনি ছাড়া তৃতীয় আর কেউ রইলেন না ঠাকুরবাড়িতে। শ্রীম ঠাকুর ঘরের দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর নিচে নামলেন। নেমে যথারীতি আহার করলেন—দোকান থেকে আনা দুখানা পাঞ্জাবি রুটি আর গরুর গাঢ় দুধ আধসের। তরকারিও একটু চাটনির মতো মুখে দিলেন। প্রসাদী ল্যাঙড়া আমও দুচার টুকরো খেলেন।

খাওয়া শেষ হলে হাত ধুয়ে শ্রীম 'কথামৃত' পঞ্চম ভাগের চতুর্দশ ফর্মা, তাঁর রচিত শেষ ফর্মার প্রুফ দেখা শুরু করলেন। এতদিনে জগদম্বা—আদিষ্ট ব্রত শ্রীম সম্পূর্ণ করলেন।

এখন রাত পৌনে দশটা। বলাই খেতে যাবেন বাড়ি, মেছুয়াবাজারে। শ্রীম তাঁকে বললেন, "আমায় এখন একলা থাকতে হবে। বাইরের দরজা বন্ধ করে গেলে যদি আমার কোনও বিপদ হয় তবে কী করে লোক আসবে?" এই কথা শুনে বলাই ভিতরের দরজা বন্ধ করে চৌকাঠের ওপর চাবি রেখে বাইরের দরজা ভেজিয়ে চলে গেলেন। তিনি ফিরলেন রাত সাড়ে দশটায়। ফিরে দেখলেন, শ্রীম মশারির মধ্যে নিদ্রিত। তাই দেখে তিনি তিনতলায় ঠাকুরঘরের সামনে জপ করতে বসলেন। কিন্তু পাঁচ মিনিট না যেতেই শ্রীম'র কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বলাইবাবু, ও বলাইবাবু!

তারপর প্রায় রাত বারোটা পর্যন্ত শ্রীম ঘরের বাইরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় বেদনায় এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। বলাই হ্যারিকেনের উপর কাপড় গরম করে বাঁ হাতে সেঁক দিয়ে যাচ্ছেন। শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে। যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে। সাহায্যের জন্য বলাই পাশের বাড়ির শ্রীরামকৃষ্ণ—ভক্ত শ্রীম'র ছোটো ভাই স্বর্গত কিশোরীবাবুর ছেলে অমিয়কে ডাকলেন। শ্রীম'র গা—বমি ভাব বন্ধ করার জন্য তিনি সোডা নিয়ে এলে শ্রীম সমস্ত সোডা—জলটুকু খেয়ে নিলেন। এবার অমিয় স্কুলবাড়িতে গিয়ে শ্রীম'র স্ত্রী—পুত্রদের সংবাদ দিলেন। তখনই শ্রীম'র বড় ছেলে প্রভাসবাবু শ্রীম'র পৌত্র বোঁচা ও দৌহিত্র হুলোকে নিয়ে ঠাকুরবাড়ি চলে এলেন।

শ্রীমর ইচ্ছায় এবার তাঁকে ঘরের ভিতর খাটটি সরিয়ে মেঝেতে সাদা কম্বলের ওপর শোয়ানো হল। তাঁর দুহাতের কনুইতে অসম্ভব যন্ত্রণা।

রাত চারটের সময় ডাক্তার ধীরেনবাবু এলেন। তিনি পরীক্ষা করে হৃদয় ও নাড়ীর বিশেষ কোনও উদ্বেগজনক বৈলক্ষণ্য দেখতে পেলেন না বলে চলে গেলেন।

শ্রীম অত কষ্টের মধ্যেও নাতিদের দেখে বলছেন, "যাও, তোমরা শোওগো যাও। তোমাদের কষ্ট হচ্ছে।" সারাজীবন শ্রীম কারও সেবা নেননি। অপরের কষ্ট হচ্ছে দেখে অত যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি অন্যের কষ্টে কষ্টবোধ করছেন।

ভোর পাঁচটা নাগাদ শ্রীম'র স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীম'র খালি গা, একটু শিহরণ বোধ করায় একটা চাদর ঢাকা দিয়ে দেওয়া হল। নিকুঞ্জদেবী বললেন, ''এবার বিছানা করে শুইয়ে দাও।''

ভালোভাবে তোষক পেতে বিছানা করে শ্রীমকে তার ওপর শুইয়ে দেওয়া হল। সোয়া পাঁচটা। শ্রীম একবার বমি করলেন। এবার ধীরে ধীরে ছটফটানি কমে আসতে লাগল। মুখশ্রী প্রশান্ত, জ্যোতির্ময় হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই প্রাণ উৎক্রমণের লক্ষণ দেখা দিল। শ্রীম নিশ্চিতকণ্ঠে বললেন, ''শরীর আর থাকবে না।'' এবার ধীরে ধীরে বাঁদিক ফিরে শুলেন, তারপর স্পষ্টস্বরে এই মর্তভূমিতে তাঁর শেষ বাক্যটি উচ্চচারণ করলেন, ''গুরুদেব, মা, কোলে তুলে নাও।''—এর মাত্র পাঁচ মিনিট পরেই শ্রীম মহাসমাধিতে লীন হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণভাগবতকার শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণলোক পাড়ি দিলেন। তখন সময় ভোর সাড়ে পাঁচটা, তারিখ ৪ঠা জুন, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শ্রীম'র মহাপ্রয়াণের খবর বেলুড় মঠে পৌঁছাল। মঠাধ্যক্ষ মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) শ্রীম'র অন্তিমকৃত্যের জন্য একজোড়া গরদের ধুতি চাদর পাঠিয়ে দিলেন মঠের তরফ থেকে।

মঠের যেসব সাধু শ্রীম'র প্রেরণায় সর্বত্যাগীর জীবন গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই এবং অন্যান্য সাধুরাও অন্তিম দর্শনের জন্য মঠাধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন শ্রীম'র ঠাকুরবাড়ির উদ্দেশ্যে। একসময় মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীম'র দ্বারা অনুপ্রাণিত সাধুদের বলেছিলেন, ''তোমাদের ভয় কী? তোমরা এমন সঙ্গ পেয়েছ মাষ্টারমশায়ের (শ্রীম'র)। এঁদের সঙ্গে থাকা, কত বড় সৌভাগ্য! ভাবনী কী? ওসব আসে ওপরে তুলবে বলে।... (অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে) না, তোমাদের কোনও ভাবনা নেই। সর্বদা ঠাকুর দেখছেন, —দেখছি যে!''[৮২] এইরকম ত্যাগীদেরও অনেকের বুক ফেটে কান্না আসছে। তাঁরা ঠাকুরবাড়িতে এসে দেখেন আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী সকলেই উচ্চৈ:স্বরে বিলাপ করছেন, আর্তনাদ করে কাঁদছেন আর বলছেন, ''আপনি তো আমায় সবচাইতে বেশি ভালোবাসতেন। এখন কে আর তেমন ভালোবাসবে?''[৮৩]

শ্রীম প্রত্যেক মানুষের অন্তরস্থ অন্তর্যামী পুরুষকে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় নিজের গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণরূপে দেখতেন ও প্রণাম করতেন। তাঁর কাছে অন্তরস্থ সচ্চিদানন্দই শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর শ্রেষ্ঠ ভালোবাসার ধন। এই দৈবী ভালোবাসার শূন্যতা পূর্ণ হওয়ার নয়। তাই বুঝি এই বিলাপ।

সাধুরা সমবেতভাবে কীর্তন শুরু করলেন পাশের ঘরে। এদিকে শ্রীম'র মহাপ্রয়াণের সংবাদ শহরময় ছড়িয়ে পড়ার পর দলে দলে মানুষ শেষ দর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ঠাকুরবাড়িতে আসতে শুরু করলেন।

বেলা এগারোটা। সাধুরা শ্রীমকে অন্তিম সাজে সাজাচ্ছেন। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে মহাপুরুষ মহারাজের পাঠানো গরদের ধুতিটি খুব সন্তর্পণে পরিয়ে চাদরটি গায়ের উপর দিয়ে দেওয়া হল। মালা চন্দনও পরানো হল। এবার সীতাপতি মহারাজ পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে শ্রীমকে আরতি করলেন। তারপর স্বামী প্রণবানন্দ আরতি করলেন ধূপ দিয়ে। এক জার্মান ভক্ত মিস ফেপার শ্রীম'র চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। অনেক সাধু—ব্রহ্মচারী এবং নিবেদিতা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ব্রহ্মচারিণীরাও অন্তিম পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

ঠাকুরবাড়ির বাইরে একটি নতুন খাটে একটি নতুন সুন্দর শয্যা প্রস্তুত করা হল। তার ওপর একটি চাঁদোয়া খাটানো হল। শ্রীম'র দেহ সেই শয্যায় শোয়ানো হল। সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তেরা এবার খাটটি কাঁধে তুলে 'জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কি জয়' বলে কাশীপুর মহাশ্মশানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন।

জ্যৈষ্ঠের প্রখর সূর্যকিরণ মাথার উপর, কিন্তু কারও হুঁশ নেই। সকলেই খালি পায়ে চলেছেন। পিছন পিছন চলেছে অজস্র মানুষ। আগে শবাধার, তারপর কীর্তনের দল, তারপর সাধুভক্তেরা।

শ্রীম'র মরদেহটি মর্টন স্কুলের উঠানো কিছুক্ষণের জন্য নামিয়ে রাখা হল। এই বাড়িরই চারতলার ছাদে তাঁর প্রিয় তপোবন, যেখানে তিনি নৈমিষারণ্যে সূত মুনির মতো পঁচিশ বছরেরও বেশি সময়ধরে শ্রীরামকৃষ্ণভাগবত শুনিয়ে অসংখ্য ভক্ত—শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছেন, অনেকের প্রাণে বৈরাগ্য উদ্দীপিত করে সাধুজীবনের মহান ব্রতে দীক্ষিত হতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

প্রতিবেশীরা সজলনয়নে ঋষিপ্রতিম শ্রীমকে শেষ বিদায় জানালে আবার শবযাত্রা শুরু হল। ধীরে ধীরে শ্মশানযাত্রীর ভিড় এত বৃদ্ধি পেল যে, কয়েক জায়গায় ট্রাম ও অন্যান্য যানবাহনের গতি কিছুক্ষণের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল। অবশেষে কাশীপুর মহাশ্মশানের যে—অংশে শ্রীরামকৃষ্ণের মরদেহের সৎকার করা হয়েছিল সেখানে নির্মিত বেদীর পূর্বদিকে দক্ষিণ—শিয়র করে শ্রীম'র খাটটি রাখা হল।

এবার অন্তিম ক্রিয়া। গব্য ঘৃতে অঙ্গলেপ, গঙ্গাস্নান তারপর কঠিন—শয্যা। শ্রীম'র শরীরটা রাখা হল উত্তর শিয়র করে ঠাকুরের চরণতলে। চারিদিকে প্রচুর চন্দন কাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হল। সাধু—ভক্তেরা শ্রীম'র অন্তিম আরতি করলেন কর্পূর ও ধূপ দিয়ে। এরপর শ্রীম'র জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাসবাবু যথাবিধি পিণ্ডদানাদি করে চিতার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে মুখাগ্নি করলেন। চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হল। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন চিতার পাশে দাঁড়িয়ে।

রাত্রি আটটার সময় চিতাগ্নি নির্বাপিত হল। হীরেন মহারাজ প্রচুর দই দিয়ে পূর্ণাহুতি দিলেন। সমবেত সাধুরা সমস্বরে বৈদিকমন্ত্র উচ্চচারণ করলেন—ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। এবার নতুন কলসী করে চিতাতে গঙ্গাজল ঢালা হলে চিতাগ্নি সম্পূর্ণ নির্বাপিত হল। নির্বাপিত চিতা থেকে অস্থি সংগ্রহ করে দুটি নতুন তামার পাত্র ক'রে, মহাপুরুষ মহারাজের নির্দেশে বেলুড় মঠে নিয়ে যাওয়া হল।

অপর কয়েকজন সাধু তখনই চিতাস্থলে ছোটো একটি মাটির মণ্ডপ তৈরি করে চারিদিকে বেড়া দিলেন, এই স্থানে পরে শ্রীম'র স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করা হবে বলে। এরজন্য কর্পোরেশনের প্রয়োজনীয় অনুমতি আগেই নিয়ে রাখা হয়েছিল। বর্তমানে সেখানে পাশাপাশি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর প্রিয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীম'র স্মৃতিমন্দির সগৌরবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও কথামৃতকারের মহিমা প্রকাশ করে চলেছে।

শ্রীম'র অস্থিপূর্ণ তাম্রপাত্র দুটি বেলুড়মঠে এনে ঠাকুরঘরে রাখা হল। পরদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার সময় শ্রীম'র অস্থিও পূজিত হল। পূজার পর মহাপুরুষ মহারাজের আদেশে অস্থিপাত্র দুটি মাথায় করে নিয়ে এসে স্বামীজীর মন্দিরে রাখা হল। এরপর ঠাকুরের অপরাপর লোকান্তরিত সন্তানদের অস্থির সঙ্গে শ্রীম'র অস্থিও নিত্য পূজিত হতে লাগল।

[শ্রীম'র মহাপ্রয়াণের চার—পাঁচদিন আগে থেকে স্বামী নিত্যাত্মানন্দ মহারাজ শ্রীম'র ঠাকুরবাড়িতে তাঁর সঙ্গেই বাস করছিলেন। কিন্তু ৩ জুন, ১৯৩২, শুক্রবার তিনি বেলুড় মঠে ফিরে আসেন। শ্রীম'র অন্তিম দিনের ঘটনাবলীর বিবরণ তিনি শ্রীম'র শেষকৃত্যের অব্যবহিত পরেই শ্রীম'র পুত্র প্রভাসবাবু ও ব্রহ্মচারী বলাইয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। বিবরণটি তিনি শ্রীম দর্শন—১৫শ ভাগের পরিশিষ্টে প্রকাশ করেন।]

প্রথমজীবনে কঠিন, ক্রুর সংসারের যে তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য শ্রীম আত্মহননের সঙ্কল্প করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে লাভ করে তিনি সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। তিনি বুঝেছিলেন, জীবনে কঠিন সঙ্কটের মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরের কৃপা লাভ হয়। তাই ভক্তদের বলতেন, ''দেখুন, কোথায় শরীরত্যাগের সঙ্কল্প আর কোথায় ভগবানলাভ।''[৮৪]

শ্রীম ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তিনি নিজেও সেকথা যথাসময়ে জেনেছিলেন। তাই তিনি পরবর্তী কালে ভক্তদের বলেছিলেন, ''পার্ষদরা থাক আলাদা। তাঁরা প্রায়ই নিত্যসিদ্ধ। যুগে যুগে সঙ্গে আসেন। তাঁদের দিয়ে কাজ করাবেন কিনা, তাই তাঁদের চিনিয়ে দেন। আবার চাবি বন্ধ করে কাজ করান। কাজ শেষ হলে খুলে দেন চাবি। তখন নিজধামে চলে যান ভক্তরা ঠাকুরের কাছে।''[৮৫]

ব্যবহারিক জগতের দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীম তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন, “Retrospecitve way—তে (পিছন ফিরে) অতীত জীবনটা দেখলে বোঝা যায়—সব তিনি করাচ্ছেন। যাকে দিয়ে যা করাবেন পূর্ব থেকে সব ঠিক করে রাখেন ও তা করান।''[৮৬]

শ্রীমকে ঠাকুর গৃহীর জীবন যাপন করতে আদেশ করেছিলেন। গৃহে থেকেই ভক্তজনকে ভাগবত কথা শোনানোর দায়িত্ব এবং চাপরাশ দিয়েছিলেন। সেই দায়িত্বই তিনি সারাজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। কিন্তু তাঁর ভাবটি ছিল, তিনি যন্ত্র, ঠাকুর যন্ত্রী। ঠাকুরই ছিলেন তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর শ্রীম সম্পর্কে বলেছিলেন, "এ আমা বই কিছু জানে না।"[৮৭]

শ্রীম'র জীবনতরণীর কর্ণধার, গুরু—সেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকেই অনন্যচিত্ত শ্রীম তাই প্রণাম জানিয়েছেন তাঁর স্বরচিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে—

সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

তথ্যসূত্র

১। *শ্রীম—দর্শন*, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ভাগ ৯, পৃঃ ২১৯
২। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অখণ্ড, পৃঃ ৮৪
৩। তদেব, পৃঃ ৪১৫
৪। তদেব, পৃঃ ২০
৫। তদেব, পৃঃ ৮৮০
৬। তদেব, পৃঃ ৪৫৭
৭। *শ্রীম—দর্শন*, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ভাগ ১, পৃঃ ২৯
৮। তদেব, ভাগ ১, ভূমিকা, পৃঃ২
৯। তদেব, ভাগ ৬, ভূমিকা
১০। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অখণ্ড, পৃঃ ৬১৪
১১। তদেব, পৃঃ ৬১৫—৬১৬
১২। *শ্রীম—দর্শন*, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ভাগ ১৩, পৃঃ ১৫৮—১৫৯
১৩। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অখণ্ড, পৃঃ ৯৭৪
১৪। *শ্রীম—দর্শন*, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ভাগ ১৩, পৃঃ ১৫৮—১৫৯
১৫। তদেব, ভাগ ১৫, ভূমিকা, পৃঃ ৫
১৬। তদেব, ভাগ ১৩, ভূমিকা, পৃঃ ১৬২
১৭। *শ্রীম সমীপে*, স্বামী চেতনানন্দ, সম্পাদক ও সংকলক, পৃঃ ১৭
১৮। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অখণ্ড, পৃঃ ১১৫৮
১৯। *শ্রীম—দর্শন*, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ভাগ ১৪, পরিশিষ্ট
২০। তদেব, ভাগ ১৩, ভূমিকা, পৃঃ ১৭৪
২১। তদেব, ভাগ ১৩, ভূমিকা, পৃঃ ১৭৪
২২। তদেব, ভাগ ১৩, ভূমিকা, পৃঃ ২০৫
২৩। *শ্রীম সমীপে*, স্বামী চেতনানন্দ, সম্পাদক ও সংকলক, পৃঃ ৮৮—৮৯
২৪। তদেব, পৃঃ ১৫
২৫। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভাগ ২, পরিশিষ্ট পৃঃ ২৪৫
২৬। *শ্রীম—দর্শন*, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ভাগ ১৩, পৃঃ ১২৭
২৭। তদেব, ভাগ ১৩, পৃঃ ৪০০
২৮। তদেব, ভাগ ১৫, ভূমিকা পৃঃ ৭
২৯। তদেব, ভাগ ১৫, পৃঃ ৪০১
৩০। তদেব, ভাগ ১৫, পৃঃ ৪০২

৩১। তদেব, ভাগ ১৩, পৃঃ ২০৫
৩২। *শ্রীম সমীপে,* স্বামী চেতনানন্দ, সম্পাদক ও সংকলক, পৃঃ ১৫৭
৩৩। তদেব, পৃঃ ৬৭—৬৮
৩৪। তদেব, পৃঃ ১৬
৩৫। তদেব, পৃঃ ১৬
৩৬। *শ্রীম—দর্শন,* স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ভাগ ১, পৃঃ ৪
৩৭। তদেব, ভাগ ১৪, ভূমিকা, পৃঃ ২—৬
৩৮। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত,* মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অখণ্ড, পৃঃ ৩৭৫
৩৯। *শ্রীম—দর্শন,* স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ভাগ ১৫, ভূমিকা, পৃঃ ৭
৪০। তদেব, ভাগ ১৪, পৃঃ ৮৭
৪১। তদেব, ভাগ ১৩, পৃঃ ৯৭
৪২। তদেব, পৃঃ ৯৯
৪৩। তদেব, ভাগ ১৫, ভূমিকা, পৃঃ ৯—১০
৪৪। *শ্রীম সমীপে,* স্বামী চেতনানন্দ, সম্পাদক ও সংকলক, পৃঃ ৫৪, ৫৭
৪৫। তদেব, পৃঃ ১৮২
৪৬। তদেব, পৃঃ ১৯৬—১৯৭
৪৭। তদেব, পৃঃ ১৭
৪৮। *শ্রীম—দর্শন,* স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ভাগ ৫, পৃঃ ১৯
৪৯। তদেব, ভাগ ১৪, পৃঃ ৮২
৫০। তদেব, ভাগ ১৪, পরিশিষ্ট, পৃঃ ২৮৯
৫১। *শ্রীম সমীপে,* স্বামী চেতনানন্দ, সম্পাদক ও সংকলক, পৃঃ ১২৯
৫২। তদেব, পৃঃ ৮৫
৫৩। *শ্রীম—দর্শন,* স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ভাগ ১, ভূমিকা, পৃঃ ৮
৫৪। তদেব, ভাগ ১, ভূমিকা, পৃঃ ৮
৫৫। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত,* মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভাগ ১, পৃঃ ৭
৫৬। *শ্রীম—দর্শন,* স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ভাগ ১, জীবনী, পৃঃ ৩৪
৫৭। তদেব, ভাগ ১২, ভূমিকা, পৃঃ ৬—৭
৫৮। তদেব, ভাগ ১, জীবনী
৫৯। *শ্রীম সমীপে,* স্বামী চেতনানন্দ, সম্পাদক ও সংকলক, পৃঃ ১১৫
৬০। তদেব, পৃঃ ১১২
৬১। *শ্রীম—দর্শন,* স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ভাগ ১৪, পরিশিষ্ট, পৃঃ ২৮৫
৬২। তদেব, ভাগ ১৫, ভূমিকা, পৃঃ ৯—১০
৬৩। তদেব, ভাগ ১৫, পৃঃ ২৩৮
৬৪। তদেব, ভাগ ৬, পৃঃ ৪
৬৫। তদেব, ভাগ ৬, ভূমিকা
৬৬। তদেব, ভাগ ১৫, পৃঃ ২৬৩
৬৭। তদেব, পৃঃ ৩৬৩
৬৮। তদেব, ভাগ ১৩, পৃঃ ১৬৫
৬৯। *শ্রীম সমীপে,* স্বামী চেতনানন্দ, সম্পাদক ও সংকলক, পৃঃ ১৬৩

৭০। *শ্রীম—দর্শন*, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ভাগ ৯, পৃঃ ১৭১
৭১। *শ্রীম সমীপে*, স্বামী চেতনানন্দ, সম্পাদক ও সংকলক, পৃঃ ৬৭
৭২। তদেব, পৃঃ ৯৪
৭৩। তদেব, পৃঃ ৯৪
৭৪। তদেব, পৃঃ ৫৬
৭৫। তদেব, পৃঃ ১৫৩
৭৬। *শ্রীম সমীপে*, স্বামী চেতনানন্দ, সম্পাদক ও সংকলক, পৃঃ ১০৭
৭৭। তদেব, পৃঃ ১১০
৭৮। তদেব, পৃঃ ৪০, ৪২
৭৯। তদেব, পৃঃ ১৪৭
৮০। *শ্রীম—দর্শন*, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, ভাগ ১৫, পরি পৃঃ ২
৮১। তদেব, ভাগ ১, ভূমিকা, পৃঃ ১১
৮২। তদেব, ভাগ ১৩, পৃঃ ১৫৭
৮৩। তদেব, ভাগ ১৫, পরি ১
৮৪। তদেব, ভাগ ১, পৃঃ ২৭
৮৫। তদেব, ভাগ ১৩, পৃঃ ২০০
৮৬। তদেব, ভাগ ১, পৃঃ ১৪
৮৭। তদেব, ভাগ ১৩, পৃঃ ২০

তৃতীয় ভাগ

শ্রীম প্রদত্ত উপদেশাবলী

উপদেশাবলীর ভূমিকা

শ্রীম—অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর কাছে 'মাষ্টারমশাই' নামেই সমধিক পরিচিত, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণভাগবত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঁচ ভাগ রচনার জন্য বিখ্যাত। শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল দেহাবসানের পর শ্রীম 'কথামৃত' অনুধ্যানই তাঁর জীবনের ব্রত করেছিলেন। তাঁর সন্ন্যাসী হওয়ার তীব্র বাসনা থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে তিনি আমৃত্যু গৃহেই ছিলেন এবং আদর্শ গৃহী তথা ঋষিতুল্য জীবন যাপন করেছিলেন।

শ্রীম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ করে এবং তাঁর সাক্ষাৎ সান্নিধ্য লাভ করে সেকালের অধ্যাত্ম—জিজ্ঞাসু বহু তরুণ যুবক বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে যোগদান করে যথাসময়ে সন্ন্যাস লাভ করেছিলেন। এঁদেরই একজন স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, পূর্বাশ্রমে যাঁর নাম ছিল জগবন্ধু রায়, দীর্ঘকাল শ্রীম'র সঙ্গ লাভ করেছিলেন। শ্রীম'র মত তিনিও তাঁর ডায়েরীতে, শ্রীম তাঁর ভক্তদের সঙ্গে যেসব অধ্যাত্ম—প্রসঙ্গ করতেন, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এই ডায়েরীগুলিকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'—এর আদলে পনেরোভাগে 'শ্রীম—দর্শন' গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এই গ্রন্থাবলীতেই গৃহী এবং সন্ন্যাসী উভয়েরই আদর্শ জীবন গঠনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শ্রীম প্রদত্ত উপদেশগুলি বিধৃত আছে। সেই উপদেশগুলিই সযত্নে চয়ন করে এখানে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। আশা করা যায়, যাঁদের সামান্য মাত্র জীবন—জিজ্ঞাসা আছে, তেমন পাঠকবর্গ এই উপদেশগুলির দ্বারা অবশ্যই উপকৃত হবেন।

প্রসঙ্গ : ঈশ্বর

● জীবের দুঃখ কষ্ট সব মঙ্গলের জন্য। দুঃখ মনকে majestic height—এ তোলে। দুঃখ না থাকলে কেউ ব্রহ্মানন্দের খবর করত না। তাই ঈশ্বর দুঃখ সৃষ্টি করেছেন। (১/১৮)

● যা অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, স্বপ্নের অগোচর তাঁর [ঈশ্বরের] কৃপায় তা সহজ হয়ে যায়। (১/১৯)

● [ঈশ্বর] দুঃখ দেন তিনি কোলে টেনে নেবেন বলে। (১/১৯)

● নভোমণ্ডলের চিন্তা করলে ঈশ্বরের বিশালতার আভাস পাওয়া যায়। (১/২০)

● ঈশ্বরই সব এবং সর্বত্র, এই বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞান হলে হয়। (১/২৩)

● তিনি [ঈশ্বর] নিজেই পৌরুষ রূপে মানুষে আছেন। আবার কৃপাও তিনি। পুরুষকার এবং কৃপা পৃথক বস্তু নহে; একই জিনিষ অবস্থা ভেদে দু'রকম দেখায়। (১/১৩৬)

● জীবাত্মা আর পরমাত্মা। এ শরীরে দুটিই আছে। হৃদয়ে পরমাত্মার অধিষ্ঠান। (১/১৬০)

● জীবত্বের conception (ধারণা)—এ তিনটি জিনিষ আছে। প্রথম অজ্ঞান অর্থাৎ, অন্তঃকরণ, দ্বিতীয় চেতনের আভাস অর্থাৎ reflection, আর তৃতীয় কূটস্থ চেতন।

আর ঈশ্বর, এতেও তিনটি ভাগ আছে। প্রথম মায়া, দ্বিতীয় মায়াতে চেতনের আভাস, আর তৃতীয় মায়ার অধিষ্ঠান চৈতন্য বা সাক্ষী চেতন।

চেতন অংশে জীব আর ঈশ্বর এক। (১/১৬০)

● Poet চিরসুন্দরকে দেখতে চায়—চিরনূতনকে। ঈশ্বর ছাড়া চির সুন্দর নিত্য নূতন আর কেহ নাই। (১/২৯০)

● লোক যাদের অসভ্য বর্ব্বর savage বলে তারাও তাঁকেই [ঈশ্বরকেই] ডাকছে। মানুষের এটা একটা necessity, ঈশ্বরকে ডাকা। সংসারে সুখ নাই কি না তাই। (১/৩১৪)

● প্রকৃতিও তিনি [ঈশ্বর] করেছেন, আবার প্রকৃতিকে জয়ও তিনিই করান। (২/৪)

● ঈশ্বর দর্শনে কুলশীলের অপেক্ষা থাকে না। ধনী দরিদ্র ভেদ নাই। (২/৬)

● সব তিনি [ঈশ্বর] করেছেন। মানুষের এই যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি তাও তিনি করেছেন। (২/১১)

● যতক্ষণ না ভগবান দর্শন হয় ততক্ষণ কর্ম। দর্শন হলে সব চুপ। (২/২০)

● সব তাঁর [ঈশ্বরের] ইচ্ছায় হচ্ছে। general rule and special rule দুই—ই আছে। general rule প্রারব্ধ ভোগ। special law তাঁর ইচ্ছা, তাঁর কৃপা। (২/২০)

● ঈশ্বরই ভাবেন আমাদের জন্য বেশী। আমরা কতটা চিন্তা করি তাঁর জন্য? আমরা ভাবি কি তিনি ভাবেন বেশী, কোনটা? তিনিই ভাবেন বেশী। (২/৫১)

● এক ঈশ্বরকে নিয়েই নানা দেশে নানা কালে, নানা ভাবে আনন্দ করছে সব লোক। এটা বুঝলেই সব আপন হয়ে যায়। তখন পর আর কেহ থাকে না। (২/৫৬)

● ভগবান দর্শন হলে তখন জগৎ ভুল হয়ে যায়। অন্য কিছু মনে থাকে না। (২/৯১)

● যে মন—বুদ্ধি বদ্ধ করে, তাই আবার মুক্ত করে প্রয়োগ জানলে। ... প্রয়োগ জানা চাই। ভগবান স্বয়ং আসেন মানুষ হয়ে এটা শেখাতে। (২/৯৭)

● ঈশ্বরের দুইটি ডিপার্টমেণ্ট আছে, বিদ্যা মায়া আর অবিদ্যা মায়া। অবিদ্যা মায়াই মনকে ঘোরায়। (২/১০১)

● তিনি [ঈশ্বর] গড়েন আবার ভাঙ্গেন। সব ভালোর জন্য করেন। তাঁতে অমঙ্গল নাই। তাঁর নাম মঙ্গলময়। বিপদ দিয়ে নিজের কাছে টেনে নিয়ে আসেন। (২/১০৩)

● সবই তিনি [ঈশ্বর] করান—এটি বুঝলেই নিশ্চিন্তি। বড় কঠিন। বুঝতে দেন না। কোথা থেকে অহঙ্কার এসে পড়ে। (২/১০৩)

● অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যিনি বাক্যমনের অতীত তিনি রূপ ধারণ করে ভক্তের সঙ্গে কথা কন। নিরাকার সাকার হন। (২/১৩২)

● আমাদের এইটুকু জানলেই যথেষ্ট—ঈশ্বর আছেন, তিনি সব করছেন আর সব হয়ে রয়েছেন। (২/১৮৯)

● ঈশ্বর কথা কন। সব দেশে সবকালেই কথা কয়েছেন। (২/১৯৬)

● ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষের একটা necessity. আবার সাকার নিরাকারের একটাতে হলেই অপরটাতেও হবে। (২/১৯৭)

● ঈশ্বর দর্শন হলে বোঝা যায় ঈশ্বরই কর্তা, মানুষ অকর্তা। যতদিন তা না হয় মনে হয় যেন স্বতন্ত্র। সাক্ষাৎ হলে দেখতে পায় সব পরতন্ত্র—ঈশ্বরের অধীন। (২/১৯৮)

● তিনি [ঈশ্বর] বোঝালে তাঁর কাজ বোঝা যায়। মানুষের কর্ম নয় তাঁর কাজ বোঝা। (২/২০৫)

● ঈশ্বরকে নিয়ে যতটুকু থাকা যায় ততটুকুই real life. (২/৩১৪)

● যাতে আমাদের মঙ্গল হবে ঈশ্বর তাই করেন। ওঁর কার্যের critisism করা উচিত নয়। ও সব করা একেবারে foolishness. বেদ বলছেন ঈশ্বর সর্বমঙ্গলময়। (৩/৬৭)

● আত্মাকে না জানা যে সব চাইতে বড় দুঃখ। খাওয়া—পরার সুখকে কি আর সুখ বলে—আত্মার সুখই সুখ। কেন না সেটি যে চিরকাল থাকবে। (৩/১৬৭)

● দুঃখ কষ্ট শরীর ধারণ করলে আছেই। যাদের তিনি [ঈশ্বর] ভালেবাসেন তাদের তিনি দুঃখ দেন। এতে মনে চৈতন্য থাকে। (৩/১৬৬)

● তিনি [ঈশ্বর] সর্বদাই কথা কন। তাঁর কথা যোগীরা শুনতে পান—গভীর রাতে। (২/২১৩)

● তাঁর [ঈশ্বর] কাছে ভালমন্দ নাই, সব ভাল, কারণ সব তিনি যে করছেন। আবার সব তিনিই হয়ে রয়েছেন। (৪/১১৫)

● সব হচ্ছে তাঁর [ঈশ্বরের] ইচ্ছায়। এইটি বোঝাবার জন্য শোক দুঃখ দেন তিনি। (৪/১৩১)

● ঈশ্বর কৃপাই মূল। তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হবার যো নাই। চেষ্টাও তাঁর কৃপাতেই হয়। (৪/১৩৩)

● আসল কথা, তাঁর [ঈশ্বরের] কৃপাতেই তাঁর দর্শন হয়। অন্য পথ নাই। (৪/১৩৪)

● তাঁর [ঈশ্বরের] দর্শন হলেই মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ হল। 'মৃত্যু' মানে জন্ম—মৃত্যু দুই—ই। মৃত্যু থাকলেই জন্ম আছে। মৃত্যুঞ্জয় যিনি তিনি জীবিত থেকেও মুক্ত, জীবন্মুক্ত। (৪/১৩৮)

● জীবত্ব মানে the doubting self (সংশয়াত্মা)। তাঁকে [ঈশ্বরকে] দেখলে শিবত্ব মানে beyond all doubts (সংশয়াতীত)। ৪/১৪০

● ভগবান যতক্ষণ ইচ্ছা করেন ততক্ষণই মানুষ তাঁর কাজ করতে পারে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া হয় না। (৪/২০২)

● তিনি [ঈশ্বর] শক্তি দিলে মানুষ কথা কইতে পারে। (৪/২০৩)

● তাঁর [ঈশ্বরের] কথা বলা কঠিন। কারুকে কারুকে দিয়ে বলান। নইলে জগতের লোকশিক্ষা হয় কি করে। তাঁদের ভিতরের অহঙ্কারটাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেন। তাঁরা তাঁর যন্ত্র হয়ে কাজ করেন। (৪/২০৪)

● তিনি [ঈশ্বর] যাদের ইচ্ছা করেন কেবল তারাই তাঁর কথা বলতে পারেন। আবার যতক্ষণ ইচ্ছা করেন ততক্ষণই বলতে পারেন। (৪/২০৫)

● যারা সব ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরকে ডাকে তারা বেশী চিনতে পারে ঈশ্বরকে। (৪/২৩৮)

● তিনিই [ঈশ্বরই] তাঁর ভক্তের জন্য সব সংগ্রহ করে রাখেন। ভক্তরা যাতে আনন্দে থাকতে পারে তিনি সর্বদা তাই করেন। যার যাতে আনন্দ সব তিনি আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখেন। (৪/২৪৪)

● অনন্ত জীবন লাভের চেষ্টা করলে এই ক্ষুদ্র জীবনের সুখ দুঃখ তত জব্দ করতে পারে না। অনন্ত জীবন মানে ঈশ্বর। (৫/৯)

● ব্রহ্মকে যে জানে সে ব্রাহ্মণ। তাঁরা (সনকাদি ঋষিরা) জেনেছিলেন। তাই [তাঁরা] যথার্থ ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য। সকলকেই এটি হতে হবে, আগে আর পরে। (৫/১৬)

● ইনি [ঈশ্বর] কেমন? না, coin মুদ্রা—এর দুই দিক যেমন। একদিকে ব্রহ্ম, অন্যদিকে এই সব [জগতের] যত কাণ্ড। (৫/৩৪)

● এই যে শব্দ আমরা শুনতে পাই তাতেও তিনি [ঈশ্বর] আছেন। তিনিই শব্দ—ব্রহ্ম। এই জন্য 'ভাগবত' তাঁর একটি রূপ [বাঙ্ময়ীরূপ] বলেছেন। (৫/৬৯)

● তাঁকে [ঈশ্বরকে] কেউ লাভ করতে পারে না, তিনি স্বয়ং ধরা না দিলে। (৫/৭১)

● তাঁকে [ঈশ্বর] দেখতে পারলে শাশ্বত, মানে everlasting সুখ লাভ হয়। কেন, না তিনি যে সুখ স্বরূপ। (৫/১৬৪)

● তিনি [ঈশ্বর] নিজেই দুভাগ হয়েছেন। জীব ভাবে জগতের সৃষ্টির কাজে যোগদান করেছেন, আর পরমাত্মারূপে নির্লিপ্ত। মানে এও জীবশিক্ষার জন্য। বলছেন, [যদি] আমার মত নির্লিপ্ত থাক, তবে ভয় নাই। (৫/১৭১)

● পরমাত্মা চির সুখশান্তির আশ্রয়। (৫/১৭১)

● তিনি [ঈশ্বর] বলেন, বিশ্বের জন্য তোমায় ভাবতে হবে না, সে ভার আমার। তোমার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না, সেও আমি দেখছি। তুমি শুধু আমার চিন্তা কর। (৫/১৮২)

● দুটি কথা, একটি ঈশ্বর আর একটি জগৎ। জগৎকে না ভালবেসে ঈশ্বরকে ভালবাসা। তাঁর কৃপায় তাঁকে ভালবাসতে পারলে তখন আর জগৎ থাকে না। তখন ''সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম''। (৫/২০৬)

● ঈশ্বরই জীবের আত্মা। তাঁকে জানলে অমৃতত্ব লাভ হয়। পরম শান্তি লাভ হয়। (৫/২৩৬)

● তাঁর [ঈশ্বরের] ইচ্ছা না হলে বিশ্বাস স্থায়ী হয় না। আলো আঁধারের মত ওঠাপড়া করে। একবার বিশ্বাস আবার অবিশ্বাস। যেন এই সূর্য এই মেঘ। ভুলিয়ে দেন তিনি তাঁর মহামায়ায়। (৫/২৩৭)

● ভগবানের জগৎ লীলার তিন অবস্থাতেই আনন্দ। কথাটা হচ্ছে এই, তিনি ছাড়া তো অন্য কিছু নাই। তাই আদি—মধ্য—অন্ত সর্বাবস্থায় আনন্দ। আনন্দ যে তাঁর স্বরূপ—''আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি।'' (৫/২৪৯)

● সিদ্ধাবস্থায় ভগবানকে সামনে দেখতে পায়। বুঝতে পাচ্ছে তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, বুঝতে পাচ্ছে স্পষ্ট—পূর্বের 'আমি—আমার' অভিমানেরও মূল শক্তিকেন্দ্র ঈশ্বরেচ্ছা। (৫/২৫৮)

● তাঁর [ঈশ্বর] নানা department আছে। যারা spiritual—এর তারা খালি তাঁর চিন্তা করবে। কিসে তাঁর দর্শন হয় সর্বদা সেই চেষ্টা। (৬/২১)

● ঈশ্বরের কাজ মানুষের বুদ্ধিতে বোঝবার জো নাই। লোকে যাকে দুঃখ বলে retrospectively (পিছন ফিরে) দেখলে তা অন্য রকম দেখায়। ... পূর্বাপর দেখলে বোঝা যায় সব মঙ্গলের জন্য হচ্ছে। (৬/৬২)

● ভগবান দর্শন হলে সংস্কার নষ্ট হয়। সংস্কার নষ্ট মানে sense world—এর সঙ্গে কোনো connection থাকে না। (৬/১৩৭)

● তিনিই [ঈশ্বরই] unity in diversity (বৈচিত্র্যের মধ্যে একমাত্র সত্য)। তাঁর কৃপায় এটা বোধ হয়ে গেলে মানুষ বেঁচে গেল। (৬/১৪০)

● ভগবানকে ডাকলে দুঃখ হবে না, এমন কিছু নিয়ম নাই। শরীর থাকলে সকলেরই দুঃখ কষ্ট হবে। তবে মনটা ঈশ্বরে রাখতে চেষ্টা কর—আমি ঈশ্বরের সন্তান, "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—এই ভেবে। তাহলে এর আঁচ মনে লাগবে না। (৬/১৪৮)

● সংস্কার জ্বলে যায় তাঁকে [ঈশ্বরকে] চিন্তা করলে। সঞ্চিত আর ক্রিয়মান কর্মের সংস্কার একেবারেই জ্বলে যায়। প্রারব্ধের একটু আধটু ভোগ হয়। (৬/১৫৬)

● 'সই' মানে সখা অর্থাৎ বন্ধু। ঈশ্বরকেই বলা যায় একমাত্র বন্ধু। তিনি সর্বদা সঙ্গে আছেন। এই 'সই'কে যদি কেউ চিনতে পারে তবে, তাকে আর জন্ম—মরণ চক্রে পড়তে হয় না—"ইহৈব তেজিতং সর্বম"। (৬/২০১)

● ঈশ্বরের প্রতি স্নেহকে প্রেম বলে। (৬/২৪১)

● নিজের চেষ্টা, গুরুবাক্যে বিশ্বাস আর ঈশ্বরের কৃপা—... এই তিনটির একত্র সংযোগ হলেই ঠিক ঠিক ঈশ্বরকে ডাকা সম্ভব হয়। (৬/২৮৯)

● এক ঈশ্বরকেই ভালবাসতে হয়। অপরকে ভালবাসলেই শোক তাপ অনিবার্য। আত্মা ছাড়া অন্য কিছু প্রিয় নাই, বেদে আছে। অতএব কেবল ঐ আত্মাকেই ভালবাস, পূজা কর জগতের সকলের ভিতর। (৬/২৯৫)

● ঈশ্বরের জন্য যা করা যায় তাই ভাল। আগে ঈশ্বরের সেবা, তারপর সংসারের অন্য কাজ। (৭/৩৭)

● ঈশ্বরকে ধরে থাকলেই শান্তি—ব্যক্তি ও সমাজের শান্তি, বিশ্বশান্তি। (৭/৬০)

● নামের ভিতর নামী অর্থাৎ ঈশ্বর রয়েছেন। (৮/৬১)

● বুদ্ধি দিয়ে প্রথম বোঝা, গুরুমুখে শাস্ত্র শুনে—ঈশ্বর আছেন। তারপর সাধন করলে অন্তরে অনুভব হয় তিনি আছেন। তারপর তাঁর কৃপায় তাঁর সাক্ষাৎকার হলে, তিনি দর্শন দিলে, তখন হয় পাকা বিশ্বাস—তিনি আছেন। (৮/৯৩)

● যাঁর চৌকশ বিচার বুদ্ধি তাঁর কাছেই ভগবান আপনাকে reveal করেন। (৮/১২০)

● আগে ঈশ্বর চিন্তা চাই। বাইরের শুদ্ধি করেই হোউক, বা না করেই হোউক। উদ্দেশ্য ছেড়ে কেবল উপায়ের পিছনে লেগে থাকা অনুচিত। (৮/১৩১)

● তিনি [ঈশ্বর] ইচ্ছা দিলে শতবাধা থাকলেও তপস্যা করে। তাঁর ইচ্ছা না হলে শত সুযোগ থাকলেও করবে না। (৮/৩০৪)

● জগৎটা খসে যায় ভগবানের টানে মন থেকে। ব্যাঙাচির ল্যাজ খসার মত। একি আর ইচ্ছে করে করে? তা নয়, আপনি খসে যায়। (৯/৩৫)

● নির্দোষ কেবল অমৃতত্ব, ঈশ্বর। (৯/৪৫)

● ভাবনাতেই ছোট বড়। বস্তুতঃ ছোট বড় নাই। সবই যে তিনি [ঈশ্বর]। 'অণোরণীয়ান মহতোমহীয়ান' তিনি। (৯/৭৪)

● তিনি [ঈশ্বর] নিজেই নিজেকে চেনেন। আর যাকে তিনি চিনান তাঁরা [তিনি?] তাঁকে চিনেন। (৯/২১৬)

● ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে মন উঠে যায়। তখন দেহকষ্ট তত বোধ হয়না। কখনও দেহ জ্ঞান লোপ হয়। (৯/২১৭)

● 'ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তা', এ বোধ হলে বেঁচে গেল। মহামায়া তাকে দিয়ে আর খেলার কাজ করাবেন না, বোঝা গেল তখন। (৯/২১৮)

● তা [ত্যাগ] ঈশ্বর করিয়ে নেন। মানুষ কিছু করেনা। কিন্তু বলে 'আমি করেছি'। তিনি বুঝতে দেন না। কেউ কেউ বুঝতে পারে তাঁর কৃপায়। তিনি ত্যাগ করিয়ে নিলে ত্যাগ হয়। (১০/৮)

● মানুষ দেখে বাইরেটা। ঈশ্বর দেখেন ভিতরটা। আবার মানুষ নিজের জীবনের অজ্ঞাত বেদনা নিজে জানেনা। সব জানেন অন্তর্যামী। (১০/১২১)

● আগুনে পুড়ে যখন লোহা লাল হয় তখন পিটলে গড়ন হয়। জুড়িয়ে গেলে হাজার পেট—কাজ হবে না, ভেঙ্গে যাবে। তাই শোক তাপ দুঃখ দেন ভগবান। মনের আবরণ পাতলা হলে তখন খানিকটা ঢুকিয়ে দেওয়া জ্ঞান— ভক্তির কথা। (১১/১৬)

● এই পরিপূর্ণ বিশ্ব এসেছে পরিপূর্ণ স্বরূপ ঈশ্বর থেকে। (১১/১৪৩)

● ঈশ্বরের সঙ্গে finite কোন জিনিষের তুলনা হয় না। তবুও অল্পবুদ্ধি লোকের মনে ঈশ্বর ভাবনাকে বসাতে হলে এই দৃশ্যমান বস্তুর সঙ্গে তুলনা করতে হয়। ঈশ্বর অতুলনীয়। (১১/১৪৪)

● আত্মা, ঈশ্বর ভিতরে আছেন বলে অন্তর্যামীরূপে সবেতে ভালবাসা। (১১/১৬৫)

● ভগবান দর্শন হলে বোঝা যায় যে free will নয়। এই যে যন্ত্রটা [দেহ] তাঁর ইচ্ছাতেই চলছে। সে অবস্থাতে কোন শোক দুঃখ দারিদ্র্য বোধ থাকে না। দেখছে সবই তিনি করছেন। (১১/১৬৮)

● মা—বাপের ঋণ শোধ হয়না। ঈশ্বরের এ দুটি রূপ। তিনি এদের কাছে কাছে রেখে দিয়েছেন ছেলেকে পালনের জন্য। (১২/২৯)

● মানুষ যেন একটি বাঁশি, একটি যন্ত্র। [ঈশ্বর] যাকে যেমন করে বাজাচ্ছেন, সেই সুর বের হচ্ছে তার ভিতর থেকে। বাঁশির ইচ্ছায় সুর বেরোয় কি? যে বাজায় তার ইচ্ছায় বেরোয়। এসব সুর তাঁরই রাগিনী। মানুষের বাহাদুরি নাই এতে। (১২/৫৩)

● ঋষিদের মত ঈশ্বর অনাদি অনন্ত, জগৎও অনাদি অনন্ত, কিন্তু প্রবাহাকারে। জীবের যখন মুক্তি হয়, তখন জগৎ সান্ত হয়ে যায়। তার কাছে জগৎ থাকেনা। থাকে কেবল ঈশ্বর—সচ্চিদানন্দব্রহ্ম। (১৩/১০৩)

● [বৈদ্যনাথ না পুরী কোথায় যাবেন সেই প্রসঙ্গে] বস্তুতঃ সবই এক। কিন্তু ভক্তের রুচি ভেদের মর্যাদা রক্ষার জন্য সেই এক নানা হয়েছেন। যার যা ভাল লাগে সে তাঁর ভজনা করুক। কিন্তু অন্তরে থাকবে ঐ উদার ভাব—এক ঈশ্বরই বহু হয়েছেন। (১৪/১৩)

● যে নিজের defect জানে তার ভয় কম। সে প্রার্থনা করবে তার হাত থেকে মুক্ত হতে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে তিনি defect শুধরে দেন। (১৪/৩৩)

● মানুষের জীবনটি ঈশ্বরের দান। জীবনের সকল উপকরণও তাঁর দান। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সও তাঁর দান। ঈশ্বরের দান—সাগরে জীবন ভাসমান।

● ঘরও তাঁর [ঈশ্বরের] বনও তাঁর। ভোগও তাঁর ত্যাগও তাঁর—এসবই তাঁর জগৎ রক্ষার আয়োজন। এক একজনকে এক এক স্থানে রেখেছেন। সকলকেই তাঁর কাজ করতে হয়। ভক্তদের হাত নেই তাতে। (১৪/১৬০)

● আমরা কি তাঁর [ঈশ্বর] কাজ করছি? তিনিই তাঁর কাজ করছেন—যন্ত্র আমরা। (১৪/২১৪)

● এই শরীর রোগ, জরা ও মৃত্যুর অধীন। কিন্তু এর ভিতর আত্মার নিবাস। তিনি শাশ্বত ও অবিনাশী, তাঁর জন্ম—মৃত্যু নাই। (১৫/২৪৯)

প্রসঙ্গ : অবতার

● Avatar is the meeting point of all contradictory forces—সকল বিরুদ্ধ ভাবের সম্মেলন ক্ষেত্র অবতার। (১/১৩৩)

● অবতারকে জানবার শ্রেষ্ঠ উপায় আগম। আগম মানে revealation অর্থাৎ তাঁর নিজ মুখের কথা। (২/১৯৫)

● অবতারের মুখ দিয়ে যা বের হয় সব revealation (বেদবাণী)। (২/১৯৬)

● অবতারের আর একটি কাজ, তিনি এসে কর্ম কমিয়ে দেন। কিসে অবসর পায় লোক তা বলে দেন। এই যে body wearing and soul-killing labour, এ থেকে কিসে তাঁকে ডাকবার সময় পাওয়া যায় তা বলে দেন। (৩/২১২)

● অবতার আসেন। যুগে যুগে আসেন। এসে বলেন, 'আমাকে চিন্তা কর'। তা'হলেই স্ব—স্বরূপকে জানতে পারা যায়। (৩/৩৬১)

● [মানুষ] অচিন্তকে চিন্তা করতে পারে না এই দেহে। তাই তিনি [ঈশ্বর] দেহ ধারণ করে আসেন। (৩/৩৬১)

● অবতার যখন আসেন তখন আকাশ বাতাস তাঁর ভাবে surcharged হয়ে থাকে। (৪/৯৪)

● শোক তাপ এ থাকবেই। অবতারকেও সহ্য করতে হয়। যাঁরা জগতে বড় হয়েছেন প্রায় সকলকেই এসবের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। (৪/১৪২)

● নির্জনে নিরাকার পরব্রহ্ম চিন্তা করলে যে ফল হয়, সেই ফলই লাভ হয় অবতারের লীলাসহচর হলে। (৪/২৭৮)

● Avatar is the highest manifestation of the Absolute. ঈশ্বর মানুষ রূপ ধরে আসেন। তারই নাম অবতার। (৫/৬৭)

● তিনি [অবতার] মানুষের সব infirmity (দুর্বলতা) গ্রহণ করেন। তাঁর দুঃখ কষ্ট দেখে, ত্রিতাপ দেখে তবে তো মানুষ ভরসা পাবে। ভক্তগণ দেখেন, এত দুঃখ কষ্টের ভিতরও সর্বদা মহাযোগে রয়েছেন—নিজের—স্বরূপ জ্ঞান জাগ্রত রেখেছেন। তবে তো তারাও এরূপ হতে চেষ্টা করবে—দুঃখ কষ্টের ভিতর তাঁকে স্মরণ রাখবে। (৫/৬৭)

● ভেদ না থাকলে লীলা হয় না। তাই মা ও ছেলে। আবার মা'ই ছেলে, কিংবা ছেলেই মা। ... এই inconceivable points (অভাবনীয় ভাবদ্বয়) যেখানে meet হয়, তাকেই অবতার বলে। (৫/২৭৩)

● অবতার যখন আসেন তিনি কি দুটি লোকের জন্য আসেন। তিনি আসেন whole humanity'র জন্য। সকলেরই উপায় তিনি বলে দিয়ে গেছেন। (৫/৩১৭)

● যখন শরীর চলে যায়, অবতার তখনও ভক্তদের দর্শন দেন। কখনও মনে শান্তি, অভয় ও আনন্দরূপে উদয় হন। (৬/২৯৭)

● অবতার ও [তাঁর] পার্ষদগণের ভিতর দুটি স্পষ্ট মানুষ দেখা যায়। একটি যেন সাধারণ মানুষ, সুখ—দুঃখময়। আর একটি দেব মানুষ—সদানন্দময় পুরুষ। মানুষের ষোল আনা দুর্বলতাও রয়েছে, আবার সকল দুর্বলতার ঊর্ধের চৈতন্যময় ভাবও রয়েছে। (৭/১৭৫)

● দেখাচ্ছে যেন জীব, কিন্তু বস্তুতঃ জীবত্ব নাই অবতারে। অবতার সর্বদাই জানেন আমি [তিনি] ঈশ্বর, মানুষের পোষাকের ভিতর। সাধারণ জীব তা জানে না—আমি [সে] ঈশ্বর। অবতার অর্থাৎ ঈশ্বর জেনে শুনে জীবত্বের অভিনয় করেন। নইলে যে খেলা হয় না, তাই। (৮/৭৫)

● শরীরধারী মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ অবতার। তাঁর ভিতর দিয়ে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেমের বন্যা আসে জগতের ভক্তদের জন্য। (৮/১১৮)

● ভালবাসা না পেলে কেউ কিছু করে না। এই ভালবাসা বিলোতে ভগবান মাঝে মাঝে মানুষ হয়ে আসেন। (৮/২২৮)

● ঈশ্বরকে প্রেমময় বলে। লোকে কি বোঝে এই কথায়? মানুষ (অবতার)—এর ভিতর দিয়ে যখন দেখতে পায় এই প্রেম, তখনই এ কথার অর্থ বোধ হয়। (৮/২৫৭)

● ঈশ্বরের শক্তির যেখানে ঠিক ঠিক প্রকাশ সেখানেই ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা। ধর্মের বাহ্য আচরণ চিরকাল আছে ও থাকবে। কিন্তু অবতার এলে ব্যাকুলতা বাড়ে। (৮/২৭৭)

● তীর্থেও তাঁরই [ঈশ্বরেরই] প্রকাশ। তিনি যখন কোন স্থানকে অবলম্বন করে প্রকট হন, তাকেই তীর্থ বলে। আর মানুষ—শরীর ধারণ করলে বলে অবতার। (৮/২৭৮)

● সাধারণ সিদ্ধপুরুষ যাঁর আত্মদর্শন হয়েছে, তাঁতে আর অবতারে অনেক তফাৎ। অবতারের এই [আমি ঈশ্বর] ভাব সর্বদা থাকে, এটি স্বাভাবিক। কারণ তিনি যে ছদ্মবেশী ঈশ্বর—সচ্চিদানন্দ মানুষ রূপে এসেছেন। (১০/১৯)

● শাস্ত্রের সদর্থ প্রকাশের জন্য ভগবান অবতার হয়ে আসেন। সর্বদাই আসেন যখন কদর্য হয়ে যায় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। (১১/৩৮)

● তাঁর [ঈশ্বরের] মানুষ রূপ [অবতার]—কে যে ভালবাসবে—শরীর, মন, আত্মা, যাকেই ভালবাসুক তার আর জন্ম হবে না। (১২/১২৭)

● সংস্কার এক অবতার পারেন বদলাতে। (১৩/১৫)

● ভিতরে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে—ঈশ্বরের দরকার। তাই ঈশ্বর অবতার হয়ে আসেন এক একবার। (১৩/২৭)

● মানুষ শরীরে ঈশ্বরকে ভালবাসা সহজ। তাই [ঈশ্বরের] মানুষ শরীর ধারণ। তাঁকে ভালবাসলেই সব হয়ে গেল। স্বরূপে তাঁকে ধরা অতি কঠিন। (১৪/২৬)

● যারা অবতারের কথা মেনে চলে, তারা সদানন্দ—জীবিতাবস্থায় তাদের আনন্দ, মৃত্যুর সময় আনন্দ, মৃত্যুর পর আনন্দ।—আনন্দ যে তাদের স্বরূপ। (১৪/২১৪)

● শরীর থাকলে এসব [অসুখ—বিসুখজনিত] সুখ—দুঃখ হবেই। কারো সাধ্য নাই এর হাত এড়ায়। অবতারেরা নিজের জীবন দিয়ে এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। (১৫/২৪২)

● অবতার হলেন ঈশ্বরের বাহ্য মুখ। পরব্রহ্মের সঙ্গে লগ্ন যিনি সর্বদা থাকেন—অবিচ্ছেদ্যভাবে সর্বদা সেটিই হল [তিনিই হলেন] অবতার। (১৫/২৪২)

প্রসঙ্গ : গুরু এবং গুরুতত্ত্ব

● নিষ্কাম সেবাতে ঈশ্বরে ভক্তি হয়। গুরু আর ইষ্টে ক্রমে অভেদ জ্ঞান হয়। (১/১৭০)

● এই সংসার রূপ কূপ থেকে ঈশ্বর ছাড়া কেউ তুলতে পারে না। তিনি গুরু রূপে এসে উদ্ধার করেন। (১/৩২২)

● গুরু কেমন—যেন lampman, ফরাশ। হ্যারিকেন, তেল, শলতে, আগুন সব ঠিক আছে—কিন্তু হ্যারিকেন জ্বলছে না। ফরাশ জ্বালিয়ে দিলে জ্বলে। (১/৩২২)

● গুরু অক্ষম, সংসারে জড়িত ভক্তদের জন্যই বেশী চিন্তিত হন। গুরু যখন ধরেন তখন আর ভাবনা থাকে না। (১/৩২৮)

● গুরু সব করতে পারেন। ... গুরু যার সহায় তার কোন ভয় নাই। (১/৩২৮)

● গুরুর কথায় বিশ্বাস হলে বেঁচে গেল। তাঁর শরণাগত হলে তিনি নিজহাতে ধরে কর্ম করান। অন্তে একেবারে কর্মত্যাগ করিয়ে নেন। (২/১৯)

● ঈশ্বরই গুরু। তিনিই মন্ত্র দেন—মানুষে প্রকাশিত হয়ে। (২/১১৭)

● গুরুর আশ্রয় লাভ করে যেখানেই থাকো ভয় নাই। তাঁর দৃষ্টি থাকে। (৩/৩৫৪)

● [গুরুকে] মানুষ বুদ্ধি করলে হবে না। গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি চাই। মন্ত্র ঈশ্বর দিয়েছেন এই বুদ্ধি চাই। (৩/৩৫৪)

● গুরুই সব করেন। শিষ্যটা ভাবছে, 'অমি সব করছি।' তা নয়। (৩/৩৬১)

● গুরু বই উপায় নাই। (৩/৩৬১)

● [বাপ—মা] এ জন্মের ভাবনা ভাবেন। যিনি গুরু তিনি অনন্তকালের কল্যাণের চিন্তা করেন। (৪/১৬)

● গুরুর অধীন হয়ে সব বিষয়ে পারদর্শী হলে শীঘ্র হয়ে যায়। ব্যবহারিক বিষয়ে যে মন দক্ষ সংস্কৃত, এই [সেই?] মনই পরে ঈশ্বরে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। (৪/৩১৬)

● সদগুরু লাভ হলে মানুষ নিশ্চিন্ত। তিনি সব করিয়ে নেন। (৪/৩১৭)

● ঈশ্বরই গুরু। আবার তিনিই অবতার হয়ে আসেন। এসে সব শিক্ষা দেন। (৪/৩১৭)

● ঈশ্বর দর্শনের পর যদি কেউ আদেশ পান তবে তিনি গুরুর কাজ করতে পারেন। (৪/৩১৭)

● গুরু লাভ হলে সংসারের উত্তাল তরঙ্গ কিছুই করতে পারে না। গুরু রক্ষা করেন। নইলে তলিয়ে যায় অতল জলে। গুরু মানে ঈশ্বর। (৪/৩২৫)

● ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর শাসনে থাকতে হয়—তবে লাভ হয়। (৫/১৯৬)

● শাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য অবতারের দরকার। ঈশ্বর মানুষ রূপ ধরে যখন আসেন, আর নিজেই গুরু হন, তখনই শাস্ত্র ব্যাখ্যা ঠিক হয়। (৬/৩০৭)

● গুরু রোখওয়ালা শিষ্য চান—করবো নয়ত মরবো, এমনি দৃঢ়—প্রতিজ্ঞ শিষ্য। তখন সব গুহ্য কথা বলেন। সবাইকে বলেন না। (৭/১৭)

● যদি বলো, আমাদের শক্তি কোথায় এরূপ [দৃঢ়—প্রতিজ্ঞ] হওয়ার? তার উত্তর—তাই তো গুরুকরণ। গুরুর শক্তির সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দেওয়া—যেমন এঞ্জিনের সঙ্গে গাড়ী। তখন গুরুর শক্তিতে ভগবান লাভ হয়। (৭/১৭)

● নিজের শক্তিতে কুলোয় না বলেই গুরুর শক্তির সহায়তা দরকার। গুরুর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। ঈশ্বরই গুরু। মানুষ গুরুতেও ঈশ্বর—বুদ্ধি চাই। (৭/১৮)

● শরীর থাকলে মেঘ আসবেই মনাকাশে। গুরুবাক্য রূপ সূর্য উঠে মেঘকে সরিয়ে দেবে। (৭/১৫৪)

● গুরুর আদেশ হলেই তাঁর [ঈশ্বরের] আদেশ, তিনি কিনা গুরুরূপ ধরে আসেন। (৮/৮৩)

● দুভাবে বলা যায় ঈশ্বরীয় কথা—গুরু ভাবে আর সেবক ভাবে। যাঁরা প্রত্যাদিষ্ট হয়ে কাজ করেন, তাঁরা গুরু ভাবে উপদেশ দিতে পারেন। অপরদের সেবক ভাবে করা উচিত। (৮/২৭৩)

● গুরু যা বলেন সেই কর্ম করতে হয়। তিনি [ঈশ্বর] গুরু রূপ হয়ে এসে যা যা বলে গেছেন তা পালন করতে হয়। শুধু তাই নয়। প্রথম তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে হয়। আর দ্বিতীয়, যা বলেছেন তা আবার চিন্তা করতে হয়। এ দুটি করলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। (৯/১৩৪)

● গুরুর, অবতারের আশ্রয়ে থেকে কর্ম করলে শীঘ্র হয়ে যায় কর্মক্ষয়। তখন চিত্ত শুদ্ধ হয়, মনের বাসনার নাশ হয়, আর জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। এরই নাম মুক্তি। (৯/১৩৭)

● গুরু কে? এক ঈশ্বরই গুরু। অবতার গুরু। আর যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন তিনি গুরু। ঈশ্বরের শক্তিই এঁদের সকলের ভিতর দিয়ে চলছে। (১৩/৫২)

প্রসঙ্গ : ধর্ম এবং ধর্মজীবন

● বৈদিক আচারের বড় প্রয়োজন। বৈদিক আচারকেই সদাচার বলে, ঋষিদের আচার। ধর্মজীবন যাপন করতে হলে এর বড্ড দরকার। (১/২৩)

● পুরুষকারের স্থান ধর্মজীবনে অতি উচ্চে। এ চাই—ই। এছাড়া ধর্মজীবন গঠিতই হতে পারে না। (১/১৩৭)

● আহারে সংযম চাই, নইলে ধর্মজীবন হয় না। (১/২২৮)

● Want না কমালে simple life হয় না, আর simple life নাহলে ধর্মজীবন হয় না। (২/১৮৫)

● ধর্ম লাভের চরম অবস্থা ঈশ্বর দর্শন। (১/২৯২)

● বাহ্য আড়ম্বর (ব্রত, উপবাস ইত্যাদি)—এর দরকার কি? শরীর রক্ষা করে ধর্ম করা। যতটা সয় ততটা করা। উদ্দেশ্য—কিসে তাঁতে [ঈশ্বরে] মন থাকে। কিসে ভক্তি লাভ হয়। (৩/৭৫)

● দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির দর্শন প্রসঙ্গে: ওখানে দাউ দাউ করে (আধ্যাত্মিক) আগুন জ্বলছে। যে প্রবেশ করে সে শুদ্ধ হয়ে যায়। সেখানে দেহ জ্বলে না, মনের ময়লা ভস্মীভূত হয়ে যায়। অমৃতত্ব লাভ হয়। ভগবান সশরীরে ত্রিশ বছর ছিলেন। একদিন থাকলেই রক্ষা নাই, তা ত্রিশ বছর। জমাট বাঁধা ধর্ম সেখানে। (৫/২৪২)

● ধর্ম সাধনে ধৃতি (ধৈর্য) যুক্ত বুদ্ধির দরকার। তবে progress করতে পারে। (৫/২৮৬)

● যে ধর্ম এই শিক্ষা দেয়, মানুষের কর্তব্য ঈশ্বর দর্শন করা, আর ঈশ্বরই এই সব হয়ে আছেন—তারই নাম সনাতন ধর্ম। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাগতিক সকল কর্তব্য ঈশ্বরের অধীন হয়ে করতে যে ধর্ম শিক্ষা দেয়, তাই সনাতন ধর্ম। (৬/২২৫)

● ভাগবত ধর্ম। ইহা ভক্তি যোগের অঙ্গ। একে শরণাগতি যোগ বলা হয়। (৭/১৫)

● ধর্ম—যা ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। (৭/৬৬)

● স্নেহ মহাশত্রু ধর্মজীবনের। (৭/২৯০)

● ভারতের culture যেন চারতলা বাড়ী। এর basement, ভিত্তি হল ব্রহ্মজ্ঞান—সম্পূর্ণ নিষ্কাম জ্ঞান। এর উপর চারটি তল—যোগী, যোগী ভোগী, সকাম ভক্ত ভোগী ও পশু ভোগী। তাই এটা অতকাল বেঁচে আছে ও থাকবে। এইজন্য এর নাম সনাতন ধর্ম—eternal religion. (৮/৯৫)

● 'সনাতন ধর্ম' মানে যা চিরকাল থাকে। 'সনা' মানে সদা। 'তন' মানে ভব অর্থাৎ থাকে। 'ধর্ম' মানে যা ধারণ করে রাখে। যে নীতি সমাজকে ধারণ করে রাখে চিরকাল, ইহকালের কল্যাণ ও পরকালের কল্যাণ করে থাকে। (৮/১৩৮)

● 'বৈদিক ধর্মই সনাতন ধর্ম। বৈদিক ধর্ম কতকগুলি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির উপর নয়। অন্য ধর্ম প্রায়ই কোন ব্যক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। (৮/১৩৮)

● জনসাধারণের জন্য ধর্মের সহজ edition মেলা ও উৎসবাদি। ভারতময় ছড়িয়ে রেখেছেন এই উৎসবাদি মহাপুরুষগণ। (৮/১৯২)

● ধর্ম আর কি? এই ছোট 'আমি'টাকে বড় 'আমি'তে ঢেলে দেওয়া। তখন এই ছোটই বড় হয়ে গেল। গঙ্গা সমুদ্র হয়ে যায়। (৯/৭৪)

● আমি ঈশ্বরের সন্তান ভাবতে ভাবতে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে যাওয়া—গুণে ও কার্যে। রূপে তো মানুষই থাকে। 'আমি মানুষের সন্তান' এই হীন ভাবকে 'আমি ঈশ্বরের সন্তান' এই মহৎ ভাবে রূপান্তরিত করা। এরই নাম ধর্ম। (৯/৭৫)

● অনিত্য বস্তু শাশ্বত সুখ শান্তি আনন্দ দিতে পারে না। কেবল ঈশ্বরে এই সব লাভ সম্ভব। এই ভগবানকে জানার নামই ধর্ম, সত্যিকার। (১০/৪৫)

● ধর্ম জীবন, মানে এই misplaced 'আমি'টাকে replace করা। এই সংগ্রামটাকে বলে ধর্মজীবন, ভাগবতজীবন, Life devine. 'আমি'টা সংসার বন্ধন থেকে উঠিয়ে নিয়ে ঈশ্বরে বন্ধন। এরই পরিণতি মুক্তি অর্থাৎ জীবের শিবত্ব লাভ। (১২/১২০)

প্রসঙ্গ : ঈশ্বর লাভের উপায়

● যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, ততক্ষণ ঋষিদের কথা শুনতে হয়। (১/২৩)

● [নানা বিষয়] জানা, এ সবেরও প্রয়োজন আছে। ভগবানের জন্য সব করা যায়। নিজের জন্য বা অপরের জন্য নয়, সব তাঁর জন্য, এ বুদ্ধি নিয়ে করলে ক্রমে তাঁর দর্শন লাভ হয়। (১/২৬)

● ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। এই দুর্লভ পদার্থ লাভ হয় যুক্তাহার—বিহারের দ্বারা। (১/৩৭)

● ষোল আনা মন দিয়ে উপায়কে না ধরলে উদ্দেশ্য [ঈশ্বর লাভ] সিদ্ধ হয় না। (১/১৭৫)

● Intellectual conviction দৃঢ় হলে তাঁর [ঈশ্বরের] কৃপায় direct realisation হয়, পরোক্ষ অপরোক্ষ হয়। (১/২২০)

● উঠন্ত যৌবন ভগবান আরাধনার প্রকৃষ্ট সময়। শরীরে বল থাকে, মনে তেজ থাকে। (১/২৩৬)

● যারা শুধু ভগবানকে চায় আর কিছু চায় না—ব্যাকুল, তাদের দেখলে উদ্দীপন হয়। এমন লোক দেখলে জোর করে মনে ঈশ্বরীয় কথা ভেসে ওঠে। (১/৩২৩)

● সাত্ত্বিক কর্মী নিজের জন্য কিছু করবে না—সব ভগবানের জন্য। বাড়ীঘর, জিনিষপত্র, নিজের ব্যবহারের সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হয়। সর্বত্র সর্বদা পূজা কি না—whole time man, whole life worship. (১/৩৩২)

● [স্থূল] দেহ অনিত্য থাকবে না—এ জ্ঞান যখন হয় তখন লোক ঈশ্বরকে চায় ঠিক ঠিক। (১/৩৪৭)

● লৌকিক বিদ্যা দ্বারা বিচারবুদ্ধি তীক্ষ্ন হয়। তা দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্ধান হতে পারে। ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য এ বুদ্ধি আসতে পারে। (২/১২৪)

● "জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী"—এই গানটি একটি মহামন্ত্র। যদি কেউ ব্যাকুল হয়ে গায় নির্জনে তবে তাঁর [ঈশ্বরের] কৃপায় দর্শন হয়। (৩/৫)

● প্রকৃতির কর্ম ফুরুলেই তাঁতে [ঈশ্বরে] মন যায়। দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়। এটিরই নাম 'summum bonum, পরমপুরুষার্থ—highest good. (৩/৩৩)

● [এই] স্নেহ দিয়ে জগৎ বেঁধেছেন [ঈশ্বর]। তার অভাব হলেই শোক। শোক কি কম—যেন দাবানল। জ্বালিয়ে মারে জীবকে। তাঁর কৃপায় এই স্নেহ যদি ঈশ্বরের উপর দিয়ে দেয় কেউ, তবেই বেঁচে গেল। বিষের অমৃত ফল হয়। (৩/৩২৭)

● বুদ্ধির jurisdiction sense knowledge, এর বেশী না। ... এই sense knowledge দিয়েই তাঁকে লাভ করা যায়—মোড় ফিরিয়ে দিলে। (৪/৯২)

● পেণ্টিং, পোয়েট্রি, এ সবই সুন্দরের উপাসনার উপকরণ। সকল সৌন্দর্যের আধার শ্রীভগবান। এই সবের উপাসকগণ এই পথ দিয়ে তাঁর কাছে অগ্রসর হয়। (৪/২০১)

● সুন্দরের উপাসকগণ জাগতিক সকল সৌন্দর্য ছাড়িয়ে পরম সুন্দরের [ঈশ্বরের] সন্ধান ক্রমে পায়। উঁচু জিনিষের চিন্তা করতে করতে মন ঐ ভাবে রঞ্জিত হয়ে যায়। শেষে বস্তু লাভ। (৪/২০১)

● ঈশ্বর দর্শনে আর্ট খুব সহায়। মনটা একাগ্র ও সংস্কৃত হয়ে রইল। তারপর এটি ঐ পথে চালিয়ে দেওয়া। (৪/২০১)

● এই যে পুত্রকন্যার সেবা এতেও ঈশ্বর লাভ হয়।—এদের ভিতর ঈশ্বর রয়েছেন, তাঁরই সেবা করছি, এই ভেবে করলে। তখন আর মোহ বন্ধনের ভয় থাকে না। (৪/২৬৬)

● সর্ব বিষয়ে independent, কেবল ঈশ্বরে dependent—এ ব্যবস্থা যারা ঈশ্বরের আনন্দ পেতে চায়, শান্তি চায়, কেবল তাদের জন্য। (৪/৩১৫)

● অমৃতকে ধরে থাকলে, সুখ স্বরূপ [ঈশ্বর]কে ধরে থাকলে নিজেও সুখময় হয়ে যায়—অমৃত হয়ে যায়। (৫/২৩৬)

● যে ব্যক্তি নিজের অবস্থা বুঝতে পেরেছে তার হয়ে যাবে সব যোগাযোগ। তিনিই [ঈশ্বরই] তার সব যোগাড় করে দেন। (৫/২৪৭)

● যারা সংস্কারবান, কিংবা যারা তাঁর [ঈশ্বরের] কৃপা লাভ করেছে তারাই তাঁকে দেখতে পাবে। চাবি তো তাঁর হাতে। তাঁর ইচ্ছা হলে কতক্ষণ তাঁকে পেতে। (৫/৩১৪)

● জগৎ রক্ষার greatest force—ই হল স্নেহ। এতেই বদ্ধ করে। আবার এই স্নেহ ঈশ্বরের দিকে চালিয়ে দিলে ওতে আবার মুক্ত হয়। (৬/২৯৬)

● ঈশ্বরের সঙ্গে একটা ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা। সংসারে কত রকমের সম্পর্ক আছে—পিতা—মাতা—ভাই—বন্ধু এর একটা বেছে নিয়ে সেটা ঈশ্বরের সঙ্গে লগ্ন করা। আর সর্বদা ঐ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে সকল ব্যবহার করা; ডাকা, খাওয়ানো, পরানো সব। আমি তাঁর দাস, পুত্র, সখা, মাতা—এর একটা হলেই হল। (৭/১৫)

● যদি হৃদয় বিহারী ঈশ্বরে মনোনিবেশ না হয়, যদি বাহ্য বিষয়ে মন যায়, তাহলে কি করা? এই সব বাহ্য বিষয়ের অন্তরে বাহিরে তিনি, এই রূপ চিন্তা করা। to realise the real (ঈশ্বর জগদ্ব্যাপ্ত) ভাবনা করা। (৭/৮৫)

● মানুষ যা ভালবাসে তাই তাঁকে [ঈশ্বরকে] দেওয়া। তাঁকে দিয়ে ভোগ করলে প্রসাদ রূপে, ক্রমে মুক্তি হবে। (৮/ভূমিকা—৫)

● সকলের সেবা করা ঈশ্বরের রূপ জেনে! তা হলে এটাই হয়ে পড়ে মুক্তির হেতু। যাতে বন্ধন তাতেই মুক্তি, মোড় ফিরিয়ে দিলে। যে মাটিতে পড়ে যায়, সেই মাটি ধরেই আবার ওঠে লোক। (৮/১৭৮)

● দুটোই পথ—idealise the real (জগৎকে ঈশ্বরভাবনা দিয়ে মণ্ডিত কর), এই একটা। আর একটা realise the ideal—ঈশ্বরকে সাক্ষাৎকার কর সত্যিকার রূপে। একটা পথে 'নেতি নেতি' করে—অর্থাৎ ঈশ্বর সংসারের কোন দ্রব্যই নয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারও নয়। আর একটা পথ 'ইতি ইতি।' অর্থাৎ সবই ঈশ্বর। (৮/১৭৮)

● দুইই চাই—চেষ্টা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস। শুধু চেষ্টায় মনে শান্তি হয় না। (৮/১৮৩)

● বিপদ সম্পদ দুটোই ত্যাজ্য। তবে ভগবান দর্শন হয়। (৯/১৪)

● যেখানে যা ভালো সেখান থেকে তা নিতে হয়। তবে হৃদয় উদার হয়। মধুকরের মত সব ভালো গ্রহণ করে একটি সুন্দর মধুচক্র রচনা করা। তারপর সেটি ঈশ্বরার্থে সমর্পণ। (৯/৪৫)

● প্রথমে মন তৈরী করা। তারপর এই মনটি তাঁতে [ঈশ্বরে] লাগিয়ে দেওয়া। তখন নিশ্চিন্তি। তখন তাঁর হয়ে সংসারে থাকা, দাসীবৎ। (৯/১২২)

● দুঃখকে sublimate (ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ) করতে পারলেই অনন্ত সুখের আস্বাদ পাওয়া যায়। (৯/২২৪)

● সমস্ত কাজ cheerfully করা। বেজার না হয়ে হাসিমুখে করা। কেন? না, সব কাজ যে ভগবানের জন্য করা। No pain is too much for God realisation. (১১/৭)

● উদ্দেশ্য ভগবান লাভ। বিদ্যালাভ সহায়। বিদ্যাতে বিচার শক্তি বাড়ে। তা দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের ইচ্ছা হতে পারে। তাই বিদ্যা লাভের দরকার। (১১/২১)

● কথাটা হচ্ছে এই, যার যা আছে তাই তাঁকে [ঈশ্বরকে] দেওয়া। আন্তরিক হলে তাতেই দর্শন দেন। (১২/১০৩)

● দুটো পথ—একটা পথ সরে দাঁড়ানো। যেমন সন্ন্যাসীরা করে। আর একটা পথ sublimation (ঈশ্বর ভাব আরোপ করা)। হীনবস্তুকে উঁচু করে দেখা। জগৎকে ঈশ্বর রূপে দেখা। তিনিই সব হয়ে আছেন। একটা পথ ধরে চলো। (১২/১৩০)

● গৃহস্থরাও পরিবার প্রতিপালন যদি ঈশ্বর বুদ্ধিতে করে তাহলে এতেও চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। তাতেই জ্ঞান প্রাপ্তি হয় তার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর দর্শন হয়। (১৩/৩৮)

● মন, মুখ, কাজ—এ তিনটা এক হলে তখন হয়। তখন একবার [ঈশ্বরের] নাম করলে মানুষ বিহ্বল হয়ে যায়। (১৩/১২৮)

● যখন [আমি মানুষ, আমার এই জাতি ইত্যাদি] এই সব লৌকিক উপাধি অভিভূত হয়ে যায়, 'আমি নিত্য শুদ্ধ আত্মা'—এই ভাবনা দ্বারা, তখনই পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হন। (১৪/১৪৭)

● আত্ম দর্শন ঈশ্বরেচ্ছা সাপেক্ষ। (১৪/১৪৮)

● ঈশ্বর যে আপনার বাপ, আপনার মা। তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য সব করেন। বাপ—মা কিছু খারাপ করতে পারেন না, এই বিশ্বাস রাখতে হয়। যখন অসহ্য হয় তখন নির্জনে গোপনে খানিকক্ষণ কাঁদা। তাহলে হৃদয়ের ভার হালকা হয়ে যায়। তখন তিনি মনের অতি নিকটে এসে যান। (১৪/১৯২)

প্রসঙ্গ : পূজা—প্রার্থনা—জপ—ধ্যান

● ব্রাহ্ম মুহূর্তে শ্রীগুরুর ধ্যান করতে হয়। (১/২৫)

● একবার 'ওঁ' উচ্চচারণ করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়। (১/৩৬)

● ব্রাহ্মমুহূর্তে [ঈশ্বর] চিন্তা করলে সহজে হয়ে যায়। এই সময় সাধু মহাপুরুষরা সব ঈশ্বর চিন্তা করেন। একটা spiritual current (আধ্যাত্মিকতার স্রোত) বইতে থাকে তখন। (১/৩৭)

● বসে বসে কৃপা কৃপা করলে কৃপা হয় না। কৃপালাভের জন্য অবস্থার প্রয়োজন। নিজের উদ্যম চেষ্টায় যখন ধরতে পারছে না, কম পড়ে যাচ্ছে, তখনই তাঁর কৃপা হয়। তখনই প্রার্থনাও ঠিক হয়। (১/১৩৭)

● শৌচ, স্নানাদি দ্বারা বহিঃশৌচ হয়। অন্তঃশৌচ ঈশ্বর চিন্তা দ্বারা, ধ্যান জপ দ্বারা হয়। অন্তঃশৌচের প্রয়োজন অধিক। (১/১৭১)

● ধ্যানের সময় লম্বা হয়ে বসতে হয়—সোজা হয়ে। 'সমশিরকায়গ্রীবাঃ'—শির, মেরুদণ্ড আর গলা এক লাইনে থাকবে। ধ্যান যদি জমে যায় আর কেউ disturb করে, তখন বজ্রাঘাতের মতন মনে হয়। (১/২৩০)

● ধ্যান কি কম জিনিষ—infinite—এর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। (১/২৩০)

● কখনও রূপ চিন্তা, কখনও লীলা চিন্তা, কখনও তাঁর মহাবাক্য চিন্তা, কখনও অরূপের চিন্তা। সবই ধ্যান। (১/২৩২)

● আমি কোথায় আছি, কি হতে চাই এটি জানা থাকলে প্রার্থনা করা যায়। (১/৩২৭)

● ধ্যান আর প্রার্থনা—এতে সব হয়। (১/৩২৭)

● ঠিক ঠিক ধ্যান হলে শরীর মন প্রশান্ত হয়। একটা স্বচ্ছন্দ ভাব হয়—যেমন সুষুপ্তির পর অনুভব হয়। (১/৩৩৩)

● জপের সময় ইষ্ট পাদপদ্ম চিন্তা প্রসঙ্গে: প্রথম একটু ধ্যান করে তাঁর চরণে নমস্কার করে জপ আরম্ভ করতে হয়। মন যেই স্থির হয়ে আসবে, তখন আপনি তাঁর পাদপদ্ম চিন্তা হবে। (১/৩৩৫)

● ভাত খাওয়া কাপড় পরেও ঠাকুরকে ছোঁয়া যায় যদি জপ করা হয়। জপাদিতে সব শুদ্ধ হয়। (১/৩৩৭)

● তাঁর [ঈশ্বরের] চিন্তা করলে—ধ্যান ভজন করলে ক্রমে এসব (দেহাদির অনিত্যতা) বোঝা যায়। তাঁর কৃপা মূল। নির্জনে গোপনে প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর কৃপা হলে এ সব বোঝা যায়। তাঁর কৃপা না হলে ধ্যানই হবে না—বোঝা তো দূরের কথা। (১/৩৪৯)

● তাঁকে [ঈশ্বরকে] আন্তরিক প্রার্থনা করলে তিনি সব মনে উদয় করে দেন, কখন কি করতে হবে। (১/৩৯৬)

● শ্রদ্ধা থাকলে ঈশ্বরীয় যে কোন নাম জপ কর, কি যে কোন ভাব ধ্যান কর, কাজ হবেই। (১/৩৯৭)

● দুঃখ কষ্ট তো ভব রোগ। এ সারাতে হলে তাঁর নাম গুণগান চাই। (২/২৪)

● মন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ একটা না একটা চিন্তা থাকবেই। লোকে বলে, চিন্তা কোরো না, তা কি হয়? মন থাকলেই চিন্তা থাকবে।তাই তাঁর [ঈশ্বরের] চিন্তা করা, অন্য চিন্তা না করে। (২/১৫২)

● শরীর তো সর্বদা সকল স্থানে [তীর্থে] যেতে পারে না। মনকে পাঠিয়ে দিলেই হল। (অন্যের মুখে তীর্থের কথা) শুনে সে বিষয়ে ধ্যান করলেও প্রায় যাওয়ার কাজ হয়। ষোল আনা না হলেও চোদ্দ আনা হয়। কারো কারো ষোল আনাই হয়—যাদের খুব powerful imagination. (২/২৫৮)

● তাঁর [ঈশ্বরের] ধ্যান করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। একবার তাঁতে মন গেলে, ভিতরের দরজা খুলে গেলে আপনা থেকে সব ঠিক হয়ে যায়। মনই তখন গুরু হয়। সব বলে দেয় কখন কি করতে হবে। (২/২৯৩)

● ধ্যান তিন রকমের হয়। রূপ চিন্তা, লীলা চিন্তা ও মহাবাক্য চিন্তা। (২/৩৩৫)

● চোখ চেয়েও ধ্যান হয়। চেয়ে ধ্যান করতে পারে কারা? যাদের পাখীর মত মন হয়েছে—ডিমে তা দিচ্ছে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি। মন রয়েছে ওখানে ডিমে। তেমনি যার মন সর্বদা ঈশ্বরেতে থাকে তিনি চেয়ে ধ্যান করতে পারেন। (৪/৯২)

● অবতার লীলার চিন্তা করা হল ধ্যান যোগের সহজ পথ। (৪/২৭৮)

● নমস্কার করা কেন? না, [যাকে নমস্কার করছি তাঁর] ভিতরে ভগবান আছেন কি না। তাই তাঁকে নমস্কার করা। এতেও পূজা হয় তাঁর। (৪/৩১৮)

● শুদ্ধ চিত্তে তাঁর [ঈশ্বরের] ধ্যান হয়। তাঁর সঙ্গে যোগ হয়ে যে কাজই করা যায়, তা ধ্যান জপের মতই হয়। এরূপ ভাবে কাজ না করলে ধ্যান হয় না। (৫/৪৭)

● ঠিক ঠিক প্রার্থনা হয় সিদ্ধাবস্থার পর। (৫/২৪৭)

● প্রথমে ধ্যান করতে হয় হাতের অলঙ্কার, তারপর আঙ্গুল। তারপর সব অঙ্গ দপ করে মনের সামনে এসে পড়ে। সাকার ধ্যানের এই নিয়ম। (৬/২৮)

● Advanced stage—এ মানস পূজা হয়। ঈশ্বরকে মন প্রাণ শরীর সব অর্পণ করে ফেলে তখন। বাকী রাখেনা কিছুই। তাই মনে পূজা। (৬/৩০)

● রাত্রে কর তাঁর [ঈশ্বরের] ধ্যান। রাতটি দিয়েছেন কেন? ভক্তরা তখন তাঁকে ডাকবে ব'লে। যারা তাঁকে ডাকবে তারা জাগবে। অন্যরা ঘুমুবে। যোগী জাগে ভোগী ঘুমোয়। (৬/৩১)

● যত গভীর ধ্যান হবে ততই ব্রহ্মানন্দের অধিক স্পর্শ লাভ করবে। তাতে ভরসা হয় আর আনন্দ দিন দিন বাড়তে থাকে। সেই আনন্দের টানে নিচেকার আনন্দ (বিষয়ানন্দ) ছেড়ে যায়। তা নৈলে কি জোর করে ছাড়াবার উপায় আছে বিষয়ানন্দ? (৭/১৪০)

● ঈশ্বর হলেন পরম ধন, অমূল্য তার দাম। সেই পরম ধনের সন্ধান পায় ধ্যানে। (৭/১৪০)

● নির্জনে ধ্যান করলে নিজের মনের ভিতর কি আছে তা ধরা পড়ে। সংস্কারগুলি তখন জাগ্রত হয়। ভাল হলে ধরে থাকা। খারাপ হলে সাবধান হওয়া ঐগুলি থেকে। (৭/২৯৭)

● রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ, এই সবগুলি দিয়ে তাঁর পূজা। (৮/ভূমিকা—৫)

● Potentiality কত নামের। আবার highly explosive, ভিতর থেকে burst, ভোগবাসনা সব crush করে দেয়, সব জ্বলে ভস্ম হয়ে যায়। এ জ্বলনে জ্বালা নাই। আছে কেবল শান্তি, প্রশান্তি। শব্দ নাই। আছে কেবল এক সুমধুর নীরবতা। (৮/৬১)

● যখন যেমন তখন তেমন। যেখানে সব রকম সুবিধা আছে, সেখানে খুব শুদ্ধ হয়ে ভালভাবে তাঁর [ঈশ্বরের] নাম কর। যেখানে তা নাই সেখানে যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থায়ই তাঁর নাম কর। উদ্দেশ্য তাঁর নাম করা। (৮/১৩১)

● নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারলেই হয়ে গেল। তখন অন্তর থেকে যথার্থ দীনতা আসে। আর সেই জন্য মন প্রাণে সদাসর্বদা প্রার্থনা চলতে থাকে। (৯/৩২)

● ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনা আন্তরিক হলে তিনি তা পূর্ণ করেন। হয়ত কাউকে পাঠিয়ে দেন। অথবা মনে চিন্তা রূপে এসে বলে দেন। (৯/১১৭)

● [ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা প্রসঙ্গে] মুখে বলতে বলতে শেষে অন্তর থেকে আসবে। মুখস্থ করতে করতে মনস্থ হয়। তারপর ঢোকে অন্তরে হৃদয়ে। (১০/১৩)

● কিছুই করতে হবে না। কেবল তাঁকে [ঈশ্বরকে] চিন্তা করা। কি করবে তোমার চিন্তা দ্বারা? কেবল প্রার্থনা—এই উপায়। (১৫/৩৮১)

প্রসঙ্গ : সাধনা এবং তপস্যা

● তপস্যা করলে মনের সংশয় অনেকগুলি আপনিই নাশ হয়, একাগ্রতা হয়। শম, দম, তিতিক্ষা এসব গুণগুলি আসে। ইন্দ্রিয় সংযম আর মনের একাগ্রতা হলেই হল। (১/৩৩০)

● শুধু পড়ে কিছু হয় না—সাধনা না করলে। (২/৭১)

● ঈশ্বর চিন্তা না করলে, তপস্যা না করলে শাস্ত্রের মর্ম বোঝা যায় না। (২/১০৬)

● ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ বহু তপস্যার ফল। এখানে জন্মালে রক্তে এ দেশের সংস্কার থেকে যায়। (২/১২৫)

● তিনি [ঈশ্বর] কর্তা আমরা অকর্তা এটা বোঝার জন্যই সাধনা। সাধনা মানে নিজেকে চেনার চেষ্টা। (২/১২৬)

● তপস্যার অর্থই হল, স্ব—স্বরূপকে চেনার চেষ্টা। (২/১৪৯)

● তপস্যা মানে গুরু মুখে, শাস্ত্রমুখে যা শোনা গেছে তার মনন করা। (২/২০৭)

● সাধন মানে, নানা জিনিষ থেকে মনটাকে কুড়িয়ে এনে তাঁতে [ঈশ্বরে] লাগানো।

● ... ব্যাকুল হয়ে তাঁকে [ঈশ্বরকে] ডাকা চাই। (২/২১১)

● তপস্যা করলে জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়, তাতে সব [বাসনা] ভস্ম হয়ে যায়। (৩/১৭৮)

● Real self এর development হয় নির্জনে তপস্যায়। (৩/৩২৪)

● সুখ দুঃখ দুইই তাঁর [ঈশ্বরের] প্রসাদ। সর্বাবস্থায় এটি স্মরণ রাখা। এই শ্রেষ্ঠ সাধন। (৩/৩২৭)

● তপস্যার মানে favourable environments—এ থেকে তাঁর [ঈশ্বরের] চিন্তা করা এক মনে। (৩/৩২৯)

● মানুষ জন্মেই কেবল সাধন ভজন করা যায়। অন্য কোন শরীরে হয় না। এই জন্মেই মোক্ষ হয়। (৪/৯৩)

● সাধন মানে কি? প্রকৃতির সঙ্গে struggle করা with a view to realise God. (৪/১৮৮)

● 'যুজে বাং ব্রহ্মপূর্বং নমোভিঃ'—নমস্কারের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। এটা সহজ সাধনা। (৫/১৭৩)

● আমার কর্ম আমি করছি, সাধকের অবস্থায় হাজার বিচার কর, এই বুদ্ধি এসেই পড়বে। (৫/২৫৮)

● তপস্যা চাই। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বুঝতে হলেও তপস্যার দরকার। (৮/৪৮)

● [শাস্ত্র পাঠ করে] মহাপুরুষদের শোনালে, সিদ্ধপুরুষদের শোনালে নিজেও শাস্ত্রের মানে বুঝতে পারে। সিদ্ধপুরুষ সর্বদা যোগে আছেন। তাঁকে শোনালে পাঠকেরও ঐ অবস্থা হয়, শাস্ত্রার্থের ধারণা হয়। (৮/৮২)

● জীবত্বের বিনাশে শিবত্বের জন্ম। তখন আর দুঃখ নাই। সর্বদা আনন্দ, সদানন্দ—জীবত্বের বিনাশের চেষ্টাই [ঠাকুরের ভাষায়] হাসপাতালে ভর্তি হওয়া। সাধনাবস্থা। (৮/২৩৯)

● তপস্যাও তাঁর [ঈশ্বরের] ইচ্ছাতেই হয়। (৮/৩০৪)

● মানুষের কর্তব্য চেষ্টা করা। যতক্ষণ আর পাঁচটা বিষয়ে পুরুষকার দেখানো হচ্ছে ততক্ষণ তপস্যার চেষ্টা করা। (৮/৩০৪)

● তপস্যা করলে এই বোঝা যায়। তপস্যা দ্বারা তাঁকে [ঈশ্বরকে] লাভ হয় না। তাঁর কৃপাতেই তাঁকে লাভ হয়। (৮/৩০৪)

● বাহ্য ত্যাগ করলে এক step এগিয়ে গেল। তখন অন্তর থেকে ত্যাগ আসতে পারে, এই সম্ভাবনা থাকে। (১০/১০)

● তাঁর [ঈশ্বরের] চিন্তা করাই তপস্যা। যে করেই কর তপস্যা, তাঁর চিন্তা না থাকলে শরীরের কষ্ট বৃথা। (১০/৪৪)

● [তপস্যার] পরীক্ষা হল ঐ—মন ঈশ্বরে যাচ্ছে কি না, আসক্তি কমছে কি না, বিশ্বাস বাড়ছে কি না। (১০/৪৪)

● [তপস্যা প্রসঙ্গে] বিবেক বৈরাগ্য বাড়ছে কিনা এর প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। (১০/৪৪)

● [সাধনা প্রসঙ্গে] মনকে ঈশ্বরে রাখতে যতটা দরকার, দেহ কষ্ট ততটা প্রয়োজন। (১০/৪৪)

● গান সহজ সাধন, শীঘ্র স্থির হয় মন। (১০/১২৫)

● সাধকের অবস্থায় ত্যাজ্য—গ্রাহ্য বিচার করা ভাল। (১৩/১১)

● কথাটা হচ্ছে, তপস্যা চাই। তপস্যা মানে, তাঁকে [ঈশ্বরকে] হৃদয়ে বসাবার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রথমে চাই। তারপর মনে যারা বসে আছে—পুত্র, কন্যা, বিত্তাদি তাদের ঈশ্বর ভাবে মণ্ডিত করতে হয়—spiritualise করা। তাদের ঈশ্বরের রূপ বলে চিন্তা করা। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করা—হে ঈশ্বর, এদের ভিতর তোমাকে দেখার শক্তি দাও। (১৩/১২৭)

● কর্ম করতে করতে নিষ্কাম হয়, জ্ঞান লাভ হয়। ঈশ্বরার্থ কর্ম করার নামও তপস্যা। স্মরণ—মনন—নিদিধ্যাসনও তপস্যা। নিষ্কাম কর্ম কিংবা তপস্যা করলে চিত্তশুদ্ধ হয়। তারপর জ্ঞান প্রাপ্তি, তারপর মোক্ষ। এই তিনটে একসঙ্গে ঝট ঝট করে হয়ে যায়। (১৪/১৪৭)

প্রসঙ্গ : সাধু

● সাধুদের দর্শন করতে হয় serious moments—এ তাঁদের ঈশ্বর চিন্তার সময়, তবেই ওঁরা যা করেন তা করতে ইচ্ছা হবে। (১/৩৫)

● যে ঈশ্বরকে চায় এমন সাধু একলা থাকে—কারো সঙ্গে নয়। (২/৫)

● ঠাকুর—দেবতা, সাধুকে নিজে সেবা করতে হয়। তাহলে impression (ধারণা) হয় বেশী। (২/১০১)

● সাধু ভক্ত অবতার, এঁরা গিয়েই তো তীর্থ উদ্ধার করেন। শঙ্কর কেদার বদ্রী উদ্ধার করলেন, চৈতন্য শ্রীবৃন্দাবন। (২/২৫৭)

● সাধু কে? যিনি সর্বস্ব ছেড়ে ভগবানকে পাবার জন্য পথে দাঁড়িয়েছেন ব্যাকুল হয়ে। (৩/২৮)

● সাধুদের ভিতরেও ত্যাগ বাইরেও ত্যাগ। (৩/২৮)

● সাধুর আশ্রমে যেতে হয় সেবা করতে, সেবা নিতে হয়। ভক্ত সেবা বড় শক্ত। অন্য লোকেদের সেবা করা বরং সহজ। (৪/১২১)

● কাম ক্রোধ সাধুর মনে উঠলেও এমনি evapourate হয়ে যায়। নীচে আসতে দেয় না। উপরেই শুকিয়ে যায় মনে। মনেই ওঠে মনেই নাশ। কিন্তু অপর লোকের তা নয়। তাদের মনে উঠে—পরে body নেয়। সাধুর মনে তা হয় না। ব্রহ্মাগ্নিতে সব ভস্মীভূত। (৪/১৮৬)

● এক থাক লোক সংসার সুখকে কাক বিষ্ঠার ন্যায় ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মানন্দের সন্ধানে তৎপর। আর এক থাক সংসার সুখে মগ্ন। এই দুই থাক লোক দুই উলটো পথে চলছে। [প্রথম থাক] সাধুদের পথই পথ। (৪/২৪০)

● সাধুরা হল জগতের conscience. (৪/২৪০)

● সাধু চলছে একলা। একলা না হলে তাঁকে [ঈশ্বরকে] পাওয়া যায় না। (৫/৭৪)

● সাধু দেখলে তাঁকে [ঈশ্বরকে] মনে পড়ে। তখন নিজের কথাও মনে হয়। আমি কোথায়, তাঁরা কোথায় আর তিনি কোথায়। তা হলেই automatically কাজ হয়ে যায়। মনে এই চিন্তা আপনা থেকে উঠে—ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে। (৫/১৬২)

● সাধু কাজ করে লোকের উপকারের জন্য। ঈশ্বর যদি সাধুদের দর্শন না দেন, তা লোক শিক্ষার জন্য। এক [এই?] জন্মে দর্শন না হলে পর জন্মে হবে। না হয় তারও পরে হবে—'অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম'। তিনি সাধুদের দিয়ে সাধন ভজন করিয়ে নেন। সাধুদের দেখে তবে লোক সাধন করবে। (৬/১২৪)

● সাধু দর্শন করতে যেতে হয়—কথা কইতে নয়। তাঁদের দর্শনই জ্ঞান। মনে হয়, তাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করে ভগবানকে ধরেছেন, তাঁকে ডাকছেন দিন রাত। (৬/১২৬)

● সাধুদের 'শান্ত' বলে। তার মানে তাদের শান্তি আছে অন্তরে। তা হলেই যথার্থ সুখ আছে। তবেই আনন্দ উপভোগ তাঁরাই করতে পারেন। (৬/২১০)

● সাধুর প্রতি যদি স্নেহ থাকে তাতে মোক্ষ লাভ হয়, তাতে মন ভগবানে যায়। (৬/২৪১)

● তপস্যা চাই প্রথম প্রথম। তারপর আনন্দ উপভোগ করা। আর সেই আনন্দের ভাগী করা লোকদের। সাধুর এই কাজ। নিজে আনন্দ লাভ করে সকলকে সেই আনন্দ বেঁটে দেওয়া। এই দ্বিবিধ কাজ সাধুরা করেন। এই দিক দিয়ে সাধু ভারতীয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য শ্রেষ্ঠ অংশ। (৭/১৩৮)

● সন্ন্যাসী জগৎগুরু। অতবড় responsibility তাঁর। সারা জগৎই তাঁর আপনার—'বসুধৈব কুটুম্বকম'—সাধু সর্বদা যোগে থাকবে। তাহলেই অপরকে দিয়েও, নিজের প্রচুর থাকবে। সাধু ও ভক্তের এ সম্বন্ধ অনন্তকাল থেকে চলে আসছে। (৭/২৬৯)

● সাধুর কেবল যোগ, ভক্তের যোগ—ভোগ। (৭/২৬৯)

● সাধু [ব্রহ্মজ্ঞানী?] ভগবানের সচল বিগ্রহ। (৭/২৭০)

● সংসারে গৃহে থাকলেই পাঁচটা কাজ এসে পড়ে। তাতে 'অনন্যচিন্তা' হয় না। যে এইরূপ গৃহ সংসার ছেড়ে পথে দাঁড়িয়েছে তার পক্ষে 'অনন্যচিন্তা'র অভ্যাস সহজ। তাঁকেই সাধু বলে। এসব general rules, তবে ব্যতিক্রমও হয়। ঘরে থেকেও [থাকলেও?] কারুকে দিয়ে 'অনন্যচিন্তা' [তিনি] করিয়ে নেন। (৭/২৭০)

● সাধুরা বিদ্যা মায়ার পূজারী। তাঁদের মন সর্বদা ঈশ্বরের দিকে রয়েছে। (৮/৩৪)

● সাধু ভগবানের রূপ। তাঁর পূজা করলে, তাঁকে পূজা করলে ভগবানকেই পূজা করা হয়। (৮/২৫৬)

● সাধু ঈশ্বরকে ধরে থাকেন। তাই যারা সাধুকে ধরে থাকে অর্থাৎ ভক্তরা, তারা ঈশ্বরকেই ধরে। (৮/২৫৭)

● সাধুরা সর্বভূতে নারায়ণ দেখেন। তাঁর সেবা করেন সকলের ভিতর। (৯/৮১)

● [সাধু কারা এই প্রসঙ্গে] গোলমালের ভিতর থেকেও যারা 'গোল' ছেড়ে 'মাল' ধরেছে। 'গোল' মানে মায়া মোহ, 'মাল' মানে ঈশ্বর। (১০/৪৫)

● সাধু সেবা ভাল, যেমন সাধুই হোক। World আর God—এর link হল সাধু—যেমন bridge. (১১/১৭)

● সাধুদের মধ্যে যাদের দেখবে শুষ্ক—গম্ভীর, কথা কন না, তাঁদের বুঝবে সবে হাঁড়ি চেপেছে। আর যাদের দেখবে আমোদ আহ্লাদ করছেন, খুব হাসি খুশি, তাঁদের বুঝবে আনন্দ লাভ হয়েছে। এই আনন্দ লাভের জন্যই অত সব আয়োজন। ত্যাগ, তপস্যা, ব্রত, নিয়ম, সাধুসঙ্গ, মাধুকরী, ভিক্ষা প্রভৃতি কত কি। (১১/১০৬)

● ভক্তদেরই advanced group—কে যারা আগে এগিয়ে গেছে তাদের বলে সাধু। তারা বীর। তারা মৃত্যু পণ করে অবিদ্যার challange—কে প্রতিরোধ করে। (১১/১৫০)

● সাধু দেখলে কি মনে হয়? ভক্ত যাঁরা তাঁরা ভাবেন, সর্বস্ব ছেড়ে তাঁকে [ঈশ্বরকে] ডাকছেন এঁরা। আমি তা পারছি না। এটা মনে হলেই হয়ে গেল কাজ। (১২/৭৩)

● সাধু ঠিক থাকলে ভক্ত ঠিক থাকবে। জগদগুরু কি না সাধু। লোক সব তাঁদের অনুকরণ করে। তাই বড় কঠিন ব্যাপার সাধু হওয়া। নিজের মুক্তি, আবার অপরের মুক্তি—দুই কাজ সাধুর। (১২/৭৭)

প্রসঙ্গ : সাধুসঙ্গ

● [মানুষের] প্রকৃতি বদলায় সৎসঙ্গে আর প্রার্থনায়। (১/৯৯)

● মরুভূমিতে যেমন ওয়েসিস, তেমনি সংসারে সাধুসঙ্গ। (২/৬৯)

● সাধুসঙ্গ বই উপায় নেই। এই একটিতে বাকি সব ঠিক করে দেয়। শাস্ত্র পড়বে—তার অর্থবোধ হবে না সাধুসঙ্গ না করলে। সাধুসঙ্গ করলে তপস্যা করার ইচ্ছা হয়, তখন ধারণা হয়। (২/৭১)

● মরুভূমিতে যেমন ওয়েসিস, তেমনি সংসারে মঠ, আশ্রম, সাধুসঙ্গ। ত্রিতাপ দগ্ধ জীব গিয়ে শান্তি লাভ করবে। (৩/৩৩)

● সাধুসঙ্গে নেশ জন্মে। তখন অন্য কিছু ভাল লাগেনা। সাধুসঙ্গে চৈতন্য হয়, বিদ্যারূপী সন্তানের জন্ম হয়। এর সাহায্যে কোনটা প্রেয় কোনটা শ্রেয় তার বিবেক জন্মে। প্রেয় মানে বিষয় ভোগ, শ্রেয় ঈশ্বর। (৩/৩৬)

● সৎসঙ্গ করলে নির্জন বাসের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। আবার নির্জন বাস করলে সৎসঙ্গে রুচি হয়। (৩/৫৪)

● সাধু সঙ্গের মাহাত্ম্য অনেক সাধুও বুঝতে পারে না। তাই অন্যত্র থাকে। যে বোঝে সে কখনও সাধুসঙ্গ ছাড়ে না। সাধুরও দরকার সাধুসঙ্গ। (৩/৭৫)

● সাধুসঙ্গ করলে সৎগুরু লাভ হতে পারে। সৎগুরু মানে যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন। (৪/২৫৪)

● সাধুসঙ্গ করতে হয়। তবে মনে তেজ বৃদ্ধি হয়। তেজ বৃদ্ধি মানে ইন্দ্রিয় সংযম। (৬/২১৩)

● নিত্য সাধুসঙ্গ করলে অন্তরে হুঁস জাগ্রত হয়—মনে হয় অধিকার দিনরাত কর্ম করবার একজন বিশ্বাসী ভৃত্যের মত, কিন্তু কর্মের ফল ভোগ করার আমার কোন অধিকার নাই। দেহ ধারণের জন্য মালিক যা দেবেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। (৮/৭০)

● দীনতা কি আর অপরের কাছে? ভগবানের কাছে। আর তাঁর স্বরূপ সাধুর কাছে। সাধুর কাছে যে দীন, সেই জগতে শ্রেষ্ঠ, জগৎ পূজ্য। তাই সাধুসঙ্গ নিত্য দরকার। (৯/৩২)

● [সংসারীর] শক্তি ক্ষয় হয় দেহ সুখে, স্নেহ বন্ধনে। এই lost শক্তি regained হয় সাধুসঙ্গে। (৯/৮১)

● মন যখন বোঝে, ঈশ্বর আগে পরে জগৎ, যেমন সাধুরা বুঝেছেন, তখন ঘরে বসে সাধুসঙ্গ করা চলে। তখন শরীরের ব্যবধান দূর হয়ে যায়। ঘর আর মঠ এক হয়। (৯/৮১)

● সাধুসঙ্গ করতে করতে মন চোদ্দ আনা তৈরী হয়। (৯/৮১)

● যাবে, সকলেই যাবে একদিন নিজের ঘরে। তবে শীঘ্র যেতে চাইলে ঐ [সাধুসঙ্গ] পথ। যারা গিয়েছে নিজ ধামে তাদের সঙ্গ করা। তাদের ভালবাসা পেলে সহজ হয়ে যায়। (১০/৪৬)

● সৎসঙ্গে শান্তি permanent. কারণ সৎসঙ্গ সৎ—স্বরূপ ভগবানকে পাইয়ে দেয়। (১০/১৬২)

● সাধুসঙ্গ, সাধু সেবাই ভগবৎ ভক্তি জ্ঞান লাভের একটিমাত্র পথ। (১১/১৭)

● সাধুসঙ্গ করলে নিজের মূল্য বোঝা যায়। তখন ঠিক ঠিক জ্ঞান লাভ হয়। (১৫/১৫৮)

প্রসঙ্গ : সন্ন্যাস

● ভোগ ত্যাগের নামই সন্ন্যাস। সে গৃহে থেকেও হয়। খুব কঠিন, কিন্তু তাঁর [ঈশ্বরের] ইচ্ছায় হয়। (২/৫১)

● সন্ন্যাসই যে সব শেষ, তা তো নয়। পথে দাঁড়ানো গেল। সেখান থেকে গন্তব্যস্থলে যাওয়া সহজ হয়। (২/৯৯)

● দুই তিন দিন নির্জনে থাকলেও world of difference. এও practical সন্ন্যাস। (২/১১০)

● সকল বিষয় বাসনার ন্যাস না হলে ঠিক ঠিক সন্ন্যাস হয় না। সেটি হয় কেবল তাঁর [ঈশ্বরের] দর্শন হলে। শেষ কথা সেটি। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততদিন তাঁর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হলেও সন্ন্যাস। এটি হলে অনেকটা অগ্রসর হল। (৩/২৮)

● ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী, শুধু পোষাকে নয়, তিনি যেখানেই দেহত্যাগ করুন, ভগবান দর্শন দেবেন। (৩/১৭৭)

● সন্ন্যাস মানে এই নয় সকলেই শুকদেব হয়ে যাবে। সন্ন্যাস মানে, সংসারের বাইরে চলে যাওয়া। বাপ—মা—পরিবারের বন্ধনের বাইরে যাওয়া। (৫/২৫৫)

● ফার্স্ট ক্লাশ (আদর্শ সন্ন্যাস, ঈশ্বর লাভই যার একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই) সন্ন্যাস হল না বলে সন্ন্যাস কিছু নয় বলা চলে না। সেকেণ্ড ক্লাশ, থার্ড ক্লাশ আছে। তবুও সন্ন্যাসী, এরা প্রণম্য, যারা ঘরে আছে তাদের। সন্ন্যাসী আর গৃহস্থের difference যেমন সুমেরু পর্বত আর সর্ষেকণা, অথবা মহাসাগর আর গোষ্পদের জল। (৫/২৫৬)

● ঋষিরা ঈশ্বরকে জেনে স্নেহ কেটে সংসারে ছিলেন। এই স্নেহ কাটার নামই সন্ন্যাস। (৬/২৯৬)

● যদি কাজ না থাকতো তবে সংসারই হত না। সংসার মানেই কাজ—ভাল মন্দ কাজ। যার কাজ নাই তার সংসার নাই, বিরজ অর্থাৎ সন্ন্যাসী। (৭/২১১)

● বাইরের সন্ন্যাস তো সাইনবোর্ড মাত্র। ভিতরের সন্ন্যাসই ঠিক। ভিতরের সন্ন্যাস মানে এক ঈশ্বরের আনন্দের জন্য ব্যাকুল। জগতের বস্তু—সাধ্য আনন্দের বাসনা মন থেকে আপনি খসে পড়েছে। এই অবস্থাই সন্ন্যাস। (৮/১৭৭)

● বাসনা ত্যাগই সত্যিকার সন্ন্যাস। (৯/১৬)

● সন্ন্যাস মানে কি? না, অখণ্ডে ঈশ্বরে মন দিয়েছে, ক্ষুদ্রবস্তু বা খণ্ড বস্তু অর্থাৎ জগৎ থেকে মন তুলে। 'সন্ন্যাস' শুনতে এক প্রকাণ্ড শব্দ শোনায়। কিন্তু তার মানে অতি সহজ—কি না, অমৃতকে, ঈশ্বরকে বরণ করেছে। (১২/১৫০)

● গেরুয়া [সন্ন্যাস] নেবার অধিকার হয় যখন কেহ চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের চিন্তা করতে সমর্থ হয়। (১৫/১৮২)

প্রসঙ্গ : সমাধি

● সমাধি জীবের normal state (সহজ অবস্থা)। কর্ম তার বিপরীত। সমাধি ও কর্ম two extremes. (২/১৮)

● যদি বল সমাধি হয় না কেন? তার উত্তর এই, নিঃশ্বাস বন্ধ হয় না কেন? মানে, যতক্ষণ নিঃশ্বাস চলছে ততক্ষণ sense-world—এর সঙ্গে যোগ আছে। এই নিঃশ্বাস চলছে বলেই মন বুদ্ধি অহঙ্কার কাজ করছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হলে, নিঃশ্বাস স্থির হলেই সমাধি। (৪/২৭৪)

● সমাধিই মানুষের normal state. তাই মানুষ তখন প্রশান্ত—স্বরূপে অবস্থিত। (৪/২৭৪)

● সমাধি হলেই কেবল তাঁকে [ঈশ্বর] দর্শন হয়। তখন মনুষ্যজীবনের problem solved হয়ে গেল। (৫/৭০)

● এই মরজগতে সমাধিবান পুরুষই কেবল জীবন্ত জাগ্রত হয়ে বিরাজ করেন। তিনি জগতে বাস করেন বটে, কিন্তু জগৎ মুক্ত, জীবন্মুক্ত। (৫/১৩০)

● তিনিই [ঈশ্বরই] সব হয়ে রয়েছেন। কখন বোঝা যায়? সাকার দর্শন আবার নিরাকার দর্শনের পর। সাকার দর্শন মানে দর্শন দিয়ে কথা কওয়া। নিরাকার দর্শন, সমাধিতে মগ্ন হওয়া। (৬/৩৩)

● কর্ম ত্যাগ মানে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া—সমাধিস্থ হওয়া। সে অবস্থায়, 'কেবলং শারীরং কর্মকুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং।' (৬/১৫৭)

● সমাধিতে [সংসারের] সুখ—দুঃখ বোধ থাকে না—অনাদি অনন্ত সুখে মন বিলীন। নিচে মন এলেই সংসারের সুখ—দুঃখের অধীন—তত্ত্ববেত্তা ও অতত্ত্বজ্ঞ উভয়েই। ... কিন্তু তত্ত্বজ্ঞের মনের সাম্য শীঘ্রই ফিরে আসে। (৯/১৫)

● সমাধি মানে হল, আর দরকার নাই এটার (সংসারের)। সমাধি না হলে এটা ছাড়া যায় না। যতক্ষণ life (জীবন) ততক্ষণ জগৎ। সমাধির অর্থ এটা ছেড়ে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। তখন আর জগৎ নাই। একটু নিচে থাকলেই জগৎ মানতে হবে। জগৎ মানলেই এদিককার সব মানা হয়ে গেল। তখন 'এ কিছু নয়' বলার জো নাই। (৯/২০৮)

● সমাধি, এ কিভাবে হয়? তাঁর কৃপা হলেই ইহা সম্ভব হয়। কেবল পুরুষকারের দ্বারা সমাধি হয় না। তাই কৃপা চাই। তবে পুরুষকার থাকলে sincere চেষ্টা হয়। তবেই কৃপা হবার সম্ভাবনা। (৯/২০৮)

● তাঁর [ঈশ্বরের] কৃপা না হলে জগৎ ছাড়ার যো নাই, সমাধি হবে না। সেই অবস্থায় সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য নিয়ে থাকা। ভক্তি—ভক্ত সাধুসঙ্গ জপধ্যান পূজাপাঠ এইসব। (৯/২০৮)

● শরীর থাকলেই মন আছে। মন থাকলে সংশয় আছে। সংশয় যায় সমাধিতে—ঈশ্বর দর্শন হলে। কিন্তু নিচে এলেই মায়ার এলাকা। সংশয় আসবে। সিদ্ধপুরুষের সংশয় হালকা হয়ে যায় সংসারে মন থাকলেও। (১০/১৬৩)

● শরীর সর্বদা অনুকূল স্থান বা অবস্থায় থাকে না। কিন্তু অভ্যাস করলে মন এই শরীর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পার। এইভাবে সংসারের শোক দুঃখ জ্বালা জয় করতে পারা যায়। ভগবানে শেষে উঠিয়ে নিয়ে রাখা মনকে। এরই চরম অবস্থা সমাধি। তখন বাইরের গুরুতর দুঃখেও মন বিচলিত হয় না। 'যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'। (১১/১৩)

● সকল ঋণ থেকে [মানুষ] মুক্ত হয় যখন সমাধি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়। (১৪/১২৯)

প্রসঙ্গ : ভক্ত এবং ভক্তি

● ঠাকুর যে বলতেন—ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন, তার কি হলো? ঠাকুরের ভক্তদের পিঠেও দুটো চোখ থাকবে—তবে তাঁর ঠিক ভক্ত। (১/১০৯)

● ভক্ত মানে যারা ঈশ্বরকে জেনেছেন অথবা জানবার জন্য ব্যাকুল। (১/১৩০)

● জন্ম যেখানেই হোক না কেন ঈশ্বর—ভক্ত দেব সেবায় লাগবে। (২/৬)

● উত্তম ভক্ত দেখেন সর্বত্র ভগবান বিরাজমান। তাই সকল জীবকে সম্মান আর সেবা করেন। নিজের ভিতরও ভগবানকে দর্শন করেন, তাই তাঁর সেবা করেন নিজেই। (২/৩৪)

● ভক্ত মানে যিনি ঈশ্বর চিন্তা করেন। (২/১১১)

● ভক্তের মত আত্মীয় আর কেউ নেই জগতে। (৩/৪০)

● ভক্ত হলে ঈশ্বরকে ডাকলে দুঃখ কষ্ট হবে না একথা কেউ মনে না করে। ... সুখ—দুঃখ দেহ ধারণ করলেই হবে। (৩/?)

● ভক্ত কি কম? যদি world—এ real কিছু থাকে তবে ভক্ত। ভক্তই অন্য রূপে ভগবান। They are leading real life. (৩/৩০৭)

● ভক্ত কাউকে উদ্বেগ দেন না, নিজেও উদ্বিগ্ন হন না। কারো কাছ থেকে কোন প্রাপ্য নেই তাঁর। সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়ায়, নিজের কোনো বিষয় কামনা না থাকায় হর্ষ, বিষাদ, ভয়, উদ্বেগ নাই। নিজের কিছুই নাই, সব তাঁর [ঈশ্বরের]। (৪/১০৪)

● 'আমি তাঁর [ঈশ্বরের]' এও জ্ঞান, 'আমিই তিনি' এও জ্ঞান। একটিকে [প্রথমটিকে] ভক্তি বলে, অপরটিকে বলে জ্ঞান। (৪/১৪৯)

● [সাধু এবং ভোগী—গৃহী, এদের] মাঝখানে আর একটা থাকের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের বলে ভক্ত। যোগ ও ভোগ দুই আছে এদের। (৪/২৪০)

● প্রকৃতিতে আদ্ধেক ভোগ রয়েছে এখনও। তাই তারা [ভক্তরা] মহাত্মাদের মত সব ছাড়তে পারে না। আবার কেবল ভোগীদের সঙ্গেও থাকতে পারে না। এরাই সাধুদের কাছে যায়, সাধুদের সেবা করে। সাধুসঙ্গে ভোগ ক্ষয় হয়। তখন তারা দু'হাতে ভগবানকে ধরে, যেমন সাধুরা ধরে আছেন। (৪/২৪০)

● নিজের বাড়িতে এলে সাধারণতঃ মানুষের মন স্থির হয়। তেমনি ভক্তদের মন স্থির [হয়] ভগবানের নিকট গেলে। কেন? না, ওটি যে ভক্তদের নিজের বাড়ী। ঈশ্বরই ভক্তদের house. (৪/২৭৬)

● ঈশ্বরে যাদের আন্তরিক বিশ্বাস তাদের মন থেকে সংসার আপনি খসে যায়—অনেকটা আলগা হয়ে যায়। কামিনী—কাঞ্চন থেকে মন উঠে যায়। সে খুব কম লোকের হয়। (৫/১৮০)

● সাধারণ মানুষ দেখে মানুষের বাহিরটা। বুদ্ধিমান লোকের দৃষ্টি লোকের গুণে। ঈশ্বরভক্তের দৃষ্টি মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্যের ওপর। (৫/১৮৭)

● ঈশ্বর ভক্তরাই ঠিক ঠিক বড় কাজ করে। (৫/৩১০)

● ভক্তরাই কারণ শরীর দিয়ে তাঁকে [ঈশ্বরকে] দর্শন করেন। কখনও কারণ মহাকারণে [ঈশ্বরে] লয় হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়। (৬/২১)

● যাদের সংস্কার আছে তারাই ফস করে বিশ্বাস করে। অন্যরা সংশয়াপন্ন। 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'। সংশয়াত্মার বিনাশ হয়। যারা বিশ্বাস করে তাদেরই বলে ভক্ত (৬/১২৯)

● শরীর থাকলেই কোনো না কোন দুঃখ কষ্ট হবেই। অবশ্য ভক্তদের শুদ্ধ মনের আনন্দের কমতি হয় না কখনও। তাই যখন শরীর চলে যায় সেই সময় ভক্তগণ আনন্দ করে পরমানন্দের কাছে যাচ্ছে বলে। (৬/১৩৭)

● [যিশুর কথা বলতে গিয়ে] যে ভক্তিতে লোকে অম্লান বদনে ক্রুশে বিদ্ধ হয়, তাকেই বলে অহেতুক ভক্তি, অহেতুক ভালবাসা। (৬/২৪৪)

● লীলার জন্য ঈশ্বর দুটি ভাব ধারণ করেছেন। একটি ভক্ত, আর একটি ভগবান। (৮/১০০)

● ভক্তদের কাছে যে কাজ উপস্থিত হয়, তারা সে কাজ ঈশ্বরের কাজ জেনে করবে। কাজের ছোট বড় নাই। (৮/১৩৪)

● কাজ অনুকূল, প্রতিকূল হতে পারে। লোক স্বভাবতঃই সংস্কারের অনুকূল কাজ পছন্দ করে। প্রতিকূল কাজে মন যেতে চায় না। কিন্তু ঠিক ঠিক ভক্ত কোনো কাজেই উদাসীন হতে পারে না। (৮/১৩৪)

● ভক্তদের কাজে (মনোযোগ, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, শ্রদ্ধা ও শান্তি) এসব গুণও থাকবে। অধিকন্তু থাকবে ঈশ্বরের সমর্পণ বুদ্ধি। তাতেই ভিতরটা শান্ত থাকে। কেন? তারা যে 'সিদ্ধাসিদ্ধৌ নির্বিকার।' (৮/১৮১)

● সংসারী লোকের শরীর সংসার ভোগ করবার উপযোগী। এ দিয়ে ঈশ্বর লাভ হয় না। ঈশ্বরীয় ভাব ভক্তি এতে প্রবেশ করে, এর সমূল পরিবর্তন করে ফেলে। নূতন শরীরটা দেখতে আগেরই মত। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। ঈশ্বর চিন্তা করে যেমন মন চিত্ত শুদ্ধ হয়, তেমনি শরীরও শুদ্ধ হয়। (৮/২৩৮)

● শুদ্ধ ভক্ত হয় বহু তপস্যা থাকলে। (৮/২৫৪)

● ঠিক ঠিক ভক্তসঙ্গ বহু তপস্যার ফল। (৮/২৫৪)

● আগে [ঈশ্বরের প্রতি] ভালবাসা দিয়ে মন তৈরী কর। ঈশ্বরে ভক্তি হোক। তখন সব অনিত্য এ বুদ্ধি আসবে। নিত্যানিত্য বিবেক হবে। (৯/৭)

● ভক্তরা ভালবাসায় কেনা। সাধারণ লোকের কাছে অবতারলীলা প্রকটিত হয় ভক্তদের এই ভালবাসা দেখে। (৯/৩৪)

● ভক্তের ভার তিনি [ঈশ্বর] নিজের হাতে নেন। আর বিশ্ব চলছে তাঁর নিয়মে। ভক্ত চলে তাঁর সাক্ষাৎ নির্দেশে। (৯/১০৩)

● ভগবানের উৎসবে যেতে হয় কষ্ট করে। তাতে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে প্রসাদ থাকলে আরও বেশী হয়। (৯/১৭৩)

● যেমন রাজ ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার রাজকোষ, তেমনি ভক্তদের জ্ঞান—ভক্তি— বিশ্বাসের ভাণ্ডার তীর্থ। (১০/৫৮)

● ভক্তদের সব কাজ ভগবান লাভের জন্য—পরমানন্দ, পরম শান্তি লাভের জন্য। তাই কোন কষ্ট বোধ হয় না। (১১/৭)

● একই জ্ঞান জীবনমুক্তি ও বিদেহমুক্তিতে। এই দুই অবস্থা জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি ভক্তি পথেও লাভ হয়, জ্ঞানপথেও লাভ হয়। (১১/৩৭)

● সকলে পাগল কামিনী কাঞ্চনে, ঠাকুর পাগল মায়ের প্রেমে। এই টানের মাঝে থাকে ভক্তগণ। ভক্তগণ মিলন সূত্র—সংসার ও ঈশ্বরের। ভক্তরাই সংসারে রস সঞ্চার করে—তবে চলে সংসার, তবে হয় এ স্থান liveable, বাসযোগ্য। (১১/৪৩)

● [শোক তাপাদি সহ্য প্রসঙ্গে] যারা আগে থেকে প্রস্তুত থাকে তাদেরই বলে ভক্ত। (১১/১৫০)

● ভক্তেরা [তীর্থে] যাবে মনের সেবা, আত্মার সেবার জন্য। সেখান থেকে যখন ফিরে আসবে, একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে আসবে। শ্রীভগবানের পুত্র রূপে ফিরবে। যাবে পিতার পুত্র রূপে, ফিরবে ঈশ্বরের পুত্র হয়ে

—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। (১৪/১০)

● [বৈদ্যনাথ না পুরী, কোথায় তীর্থ করতে যাবেন সেই প্রসঙ্গে] বস্তুতঃ সবই এক। কিন্তু ভক্তের রুচি ভেদের মর্যাদা রক্ষার জন্য সেই এক [ঈশ্বর] নানা হয়েছেন। যার যা ভাল লাগে সে তার ভজনা করুক। কিন্তু অন্তরে থাকবে ঐ উদার ভাব—এক ঈশ্বরই বহু হয়েছেন। (১৪/১৩)

● নিরানন্দময় সংসারে তিনি [ঈশ্বর] ভক্তদের রক্ষা করেন এই সাময়িক আনন্দ দিয়ে, শান্তি দিয়ে। ক্রমে ভক্তগণও তাঁর হাত দেখতে পায়। তখন অত বিচলিত হয়না শত বিপদেও (১৪/১৯২)

● ভক্তিতে সব শুদ্ধ হয়। এই একটি থাকলে সব আছে। এটার অভাবে সব নষ্ট। [ভক্তিতে] ভক্তের কাছে ভগবান বাঁধা পড়েন। (১৫/৬১)

● ভক্তের কাছে ভগবান জীবন্ত জাগ্রত। সর্বদা চোখের সামনে তাঁকে দেখে। তাই নিজ শরীরেরই মত তাঁকে ভালবাসে আর তাঁর যত্ন নেয়। (১৫/১১০)

প্রসঙ্গ : শরণাগতি

● তাঁর [ঈশ্বরের] ইচ্ছায় সব সম্ভব হতে পারে। তাঁর শরণাগত হলে সব হতে পারে। প্রারব্ধও নাশ হয় তাঁর ইচ্ছায়। তা যদি না পারেন তবে সর্বশক্তিমান কি সে? কিন্তু শরণাগত হওয়া চাই। (২/২০)

● তাঁর [ঈশ্বরের] (সৃষ্টির) scheme—টি এমন যে [তাতে] অজ্ঞানতা থাকবেই। উপায় তাঁর শরণ। শরণাগত হলে আর সংসারে বদ্ধ করেন না। (২/৪৭)

● [ঈশ্বরের] শরণাগত হলে 'দুরত্যয়া' মায়া থেকেও পরিত্রাণ লাভ হয়। (২/৫১)

● তাঁর [ঈশ্বরের] শরণ নিয়ে সংসার করলে বিপদে অত মূহ্যমান হতে হয় না। (২/১০৩)

● তাঁর [ঈশ্বরের] শরণাগত হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি কর্তাগিরি কমিয়ে দেন। কর্তাগিরি কম পড়লেই শান্তি, আনন্দ। (২/১২৭)

● সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়া। কিছু নিজের, কিছু ঈশ্বরের, তাতে হয় না। (৪/১০২)

● মন মানুষকে নাচাচ্ছে। মন যাঁর [ঈশ্বরের] হাতে তাঁর শরণ নেওয়া। (৫/৫৭)

● নমস্কার করেও যোগ হয়। গীতায় আছে ''মাং নমস্কুরু''। শিষ্যরাও তাই করুক এই অভিপ্রায়। নমস্কার করা মানে শরণাগত হওয়া। (৫/১৭৩)

● যদি কেউ প্রশ্ন করে—কেন ঈশ্বরের শরণ নেব, কেন তাঁকে ধরব? তার উত্তর, তিনি এই সব [জগৎ?] ধরে রয়েছেন। অতএব অমাদের উচিত তাঁকে ধরা। (৫/২৩৬)

● তাঁর [ঈশ্বরের] শরণগত হলে এই প্রারব্ধ কর্মের ভোগ তিনি হাতে ধরে করিয়ে নেন। তিনি ইচ্ছা করলেই এই ভোগও না করাতে পারেন। কর্মফল ভোগ করতে হলেও তিনি কমিয়ে দেন। কিম্বা মন তাঁতে টেনে নেন, কর্ম ভোগ হয়ে যাচ্ছে আপনি। এতে ভোক্তার বোধ নাই। (৬/১৫৭)

● শরণাগতি—যোগ মানে, নিজের দোষ নিজে জেনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা। ঈশ্বরকে ছেড়ে দিয়েও থাকতে পারে না, আবার তাঁর দেওয়া উত্তম ধর্ম ব্যবস্থা পালনেরও শক্তি নাই। এই অবস্থায় শরণাগতি ছাড়া উপায় নাই। (৭/১৫)

● শরণাগত, প্রভো, শরণাগত। এই এক পথ বাঁচবার। 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'—অন্য পথ নাই। (৮/৬১)

● [সাধক] চেষ্টা করছে, একটু একটু করে ছাড়ছে। তারপর দেখে, মন থেকে আসক্তি যায় না। তখন হয় সাধক শরণাগত। (১০/৮)

● গুরুর শরণাগত না হলে দুঃখ নিবৃত্তি হয় না, বেড়ে যায়। (১৩/৫০)

● যদি কেউ প্রকৃতি বদলাতে চায় তবে তাঁর [ঈশ্বরের] শরণ নিক—কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হয়ে শিশুর মত। তবে হয়। তাঁর ইচ্ছায় সব সম্ভব। (১৩/৫৭)

● মৃত্যু পর্যন্ত পালিয়ে যায় তাঁর [ঈশ্বরের] দোহাই দিলে। প্রার্থনা আর শরণাগতি—এই উপায়। খালি কেঁদে কেঁদে বল—মা, রক্ষা কর, রক্ষা কর মা। (১৫/৩৫)

প্রসঙ্গ : সংসার

● ত্যাগের পথে বিঘ্ন স্নেহ। স্নেহতেই সংসার চলছে। সংসারই স্নেহ। এইটি ঈশ্বরের চাতুরী। এ দিয়ে তিনি জগৎকে বেঁধে রেখেছেন। (১/৮৬)

● স্ত্রীলোকের সৃষ্টি ভগবানের জগৎ রক্ষার একটি অপূর্ব কৌশল। (১/১৯৫)

● এটি দিয়ে মহামায়া সংসার রচনা করেছেন—এই সঞ্চয়ে প্রীতি, কেবল নিয়ে প্রীতি। (৪/১৮)

● সুখ—দুঃখ এরই নাম সংসার। সংসার দ্বন্দ্ব ক্ষেত্র। তত্ত্বদৃষ্টিতে বিষয়সুখকেও দুঃখ বলে দেখা যায়। কারণ এই সুখের পরই দুঃখ আসবে। দুটো একসঙ্গে চলছে। তাই এ দুটোই ত্যাজ্য। (৪/১৪৩)

● এই (নশ্বর বস্তুর) অভাব বোধ অনন্ত দুঃখের কারণ, এটাই জন্মমরণ চক্রে [সংসারে] ফেলে দেয়। (৫/১৭)

● তিনি [ঈশ্বর] সব করে দিয়েছেন। তুমি বলছ আমার এ সব, দেহমন, ধনজন, এই জগৎ। এ সব তাঁর জানলে তবেই সবেতে শ্রদ্ধা আসবে, পবিত্র ভাব আসবে। মনে হবে ভোগের জিনিষ নয়, পূজার জিনিষ এই জীব জগৎ। এ বুদ্ধি এলেই বেঁচে গেল। (৫/১৬৪)

● বিপদ আর দুঃশ্চিন্তা, এরই নাম সংসার। (৭/৩৭)

● তাঁরই [ঈশ্বরেরই] অবিদ্যায় মানুষ অজ্ঞানান্ধ। এই অবিদ্যা শক্তির প্রভাবে তিনি বিশ্ব রচনা ও রক্ষা করছেন। জল—হাওয়া—অগ্নি, শষ্য, পিতৃ—মাতৃ স্নেহ, এ দিয়ে বিশ্বকে বেঁধে রেখেছেন। (৭/৪১)

● আজ সুখ কাল দুঃখ, কাল দুঃখ আজ সুখ—এই জগতের রীতি। (৯/১৫)

● সংসারে থাকতে হলে সব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। আলগা হলে সংসার চলে না। লোক ঠকিয়ে নেবে। (৯/১২১)

● সত্যাদিকে অবলম্বন করে অর্থ—কাম ভোগ করলে তবে মোক্ষ লাভ হতে পারে। যদি সংসার ভোগ করতে গিয়ে মোক্ষ অর্থাৎ ভগবান ভুল হয়ে যায়, সেই ভোগ ত্যাজ্য। এইটি সনাতন আদর্শ গৃহস্থাশ্রমের। (১১/৩০)

● সংসারে যত রকম speculation (অনিশ্চিত বস্তু লাভের আশায় ঝুঁকি লওয়া) আছে, তার মধ্যে ঈশ্বর লাভের জন্য ঝাঁপ মারা সকলের চাইতে বড়। এর তুলনা নেই। (১২/১৫০)

● Relative plane—এ ছোট—বড়, ভাল—মন্দ সব আছে। আর থাকবেও। তা নইলে জগৎ থাকে না। বিচিত্রতা জগতের ধর্ম। (১৩/১০২)

● সুষুপ্তিতে তাঁর [ঈশ্বরের] নিকট এসে যায় জীব। আর বিপদে পড়ে কাঁদলেও জাগ্রতাবস্থায়ই জীব তাঁর নিকট এসে যায়। এই দুটি ব্যবস্থা তার জগৎ রক্ষার বিচিত্র উপায়—সুষুপ্তি অর ক্রন্দন। (১৪/১৯২)

প্রসঙ্গ : কর্ম

● সাত্ত্বিক কর্মী কাজ জমিয়ে রাখেনা—সর্বদা করছে। ক্লান্তি নাই—একা একশো জনের কাজ করতে পারে। (১/৩২৬)

● সাত্ত্বিক সাধক তাড়াতাড়ি সব [বিষয়] কাজ সেরে নেয়, বাকী সময় ঈশ্বর চিন্তা করে। (১/৩৩০)

● শক্তি তো একটাই। তাই সবই বিদ্যা, কোনোটাই অবহেলা করবার জো নাই। যেটুকু করতে হয় ভালো করে করা উচিত। (১/৩৩১)

● কর্তব্য দুই রকম আছে। একটাতে বন্ধন, অপরটাতে মুক্ত হয়। যা অজ্ঞান থেকে করা যায়—যেমন ছেলে মেয়ে সংসারের জন্য যা করা তাতে বন্ধন হয়। আর ঈশ্বরই পুত্র কন্যা রূপে আমার সেবা গ্রহণ করছেন এই ভেবে কর্তব্য করলে তাতে মুক্ত হয়। একে নিষ্কাম কর্ম বলে। (৩/১১৪)

● কাজ করতে হয় নিজেকে অকর্তা জেনে কর্তার মত। (৩/১৮৭)

● 'সৎকর্ম' মানে গোটা কয়েক কর্ম বেছে নেওয়া যেগুলি directly ভগবানের উদ্দীপন করে। (৪/১০২)

● সব তাঁর [ঈশ্বরের]—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার—সব তাঁতে উৎসর্গ করে কর্ম করার চেষ্টা। এটি ঠিক ঠিক হয় ভগবান দর্শন হলে। তার পূর্বে সাধকের অবস্থায় এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে sincerely সাধ্যমত চেষ্টা করা। (৪/১০২)

● 'সর্বকর্ম' মানে যা কিছু করা যায় শুভ অশুভ স্বাভাবিক সব কাজ। স্বাভাবিক কর্ম কি দুষ্কর্ম সবই তাঁতে সমর্পণ করা উচিত। (৪/১০২)

● সকলের এক নিয়ম খাটে না। কিন্তু দেহধারণ সম্বন্ধে সকলের জন্যই এই ব্যবস্থা, নিজের কাজ নিজে করা। (৪/৩১৬)

● প্রথম গুরুবাক্য শুনে কাজে লাগা, কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে ভজন থাকলে গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হয়। ক্রমে যখন কাজ উপাসনা হয়—ধ্যানের কাজ করে। (৫/৪৮)

● সিদ্ধাবস্থায়ও দুই রকমের কর্ম থাকে। একটি শরীর ধারণের জন্য কর্ম— অন্নাপানাদি, অপরটি প্রত্যাদিষ্ট কর্ম অথবা প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য কর্ম। এই উভয় কর্মেরই বন্ধন শক্তি নাই। ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যন্ত্রবৎ কর্ম করে, তাই স্বতন্ত্র অহঙ্কার না থাকায় নিজের দায়িত্ব নাই। তাই বন্ধন নাই। (৫/২৫৮)

● কর্ম সকলকেই করতে হয় একটু আধটু। সব তাঁর [ঈশ্বরের] কর্ম করা যাচ্ছে জেনে করলে আর গোল বাধে না। (৬/২২)

● সত্ত্বগুণী কর্মীর লক্ষণ আছে। তিনি হবেন মুক্তসঙ্গ আর অনহংবাদী। 'ধৃত্যোৎসাহসমন্বিত' আর 'সিদ্ধাসিদ্ধনির্বিকার'। (৬/২৩)

● চোখ দিয়েছেন কেন ঈশ্বর, বুদ্ধি দিয়েছেন কেন? তাদের ব্যবহার করতে হবে না? সমাধিস্থ হলে এসবের দরকার নাই। তার নীচে থাকলে এ সবের best application করতে হবে। এর দ্বারা যা লাভ হবে তা নিজের সেবায় না লাগানো, ভগবানের সেবায় লাগানো। এরই নাম কর্মযোগ। (৬/১৩৫)

● "প্রারব্ধ" মানে যে সংস্কার ফল দিতে আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ যে কর্ম সংস্কারের জন্য এই শরীর হয়েছে। (৬/১৫৭)

● যাবৎ [স্থূল] শরীর তাবৎ কর্ম। (৬/১৫৭)

● অপূর্ণ যে তারই ভোগে কর্মে স্পৃহা থাকে। (৬/২৩৫)

● ঠিক ঠিক কর্ম করতে পারেন যিনি সিদ্ধ হয়েছেন। তিনি জানেন কোন কর্মে বন্ধন আর কিসে মোক্ষ। নেহাৎ কর্ম করতে হলে সিদ্ধপুরুষের অধীনে থেকে কর্ম কর। তাতে বন্ধনের ভয় কম। ভক্তির কর্ম ভাল। (৭১৩)

● যখনকার যে কাজটি তখনই সেটি করা। এক নিমেষও ফেলে না রাখা। এ করলে পরিশ্রম কমে যায়। তার ফলে অবসর মিলে। তখন ঈশ্বর চিন্তা করা যায়। তাহলে আনন্দ ও শান্তি লাভ হয়। (৭/১৩৯)

● নিজের ধাতে, নিজের ভাবে কাজ করলে কাজটি হয় উত্তম। এতে নিজেরও কল্যাণ আর জগতেরও কল্যাণ। তাতেই উভয় পক্ষের আনন্দ। (৭/১৪৯)

● জীবন্মুক্তদের কতকগুলি কাজ থেকে যায়। স্বাভাবিক কাজ, শরীর ধারণের কাজ। আবার প্রারব্ধ। ভাল মন্দ উভয়ই ভোগ করতে হয়। সমাধিস্থ হলে কেবল কাজ থাকে না। নিচে মন নামলেই কাজ। আবার কেহ কেহ লোক সংগ্রহের জন্য কাজ করে। (৭/২১১)

● শুধু কাজ করলেই হয় না। প্রথম, অল্প সময়ে অধিক কাজ চাই। দ্বিতীয়, নির্ঝঞ্ঝাট যাতে হয়। তৃতীয়, কাজটি সম্পূর্ণ সুন্দর হবে। চতুর্থ, কর্মে বদ্ধ না করে। (৮/১০৪)

● কর্ম করলেই হয় না। উদ্দেশ্য ঠিক করে করা। যখনই উদ্দেশ্য কম পড়বে, তখনই ধ্যান জপ বেশী করতে হয় নির্জনে বসে। (৮/১০৪)

● ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে, গুরুবাক্যে বিশ্বাস থাকলে সব কাজে আঁট হয়। কারণ তখন সব কাজ ভগবানের কাজ জেনে করে কি না। ভগবানের কাজে তো শিথিলতা আসতে পারে না। (৮/১৩৩)

● নিষ্কাম কাজ করে মনে আনন্দ হলেই বোঝা গেল কাজ ঠিক হয়েছে। (৮/১৭৪)

● [বিষয়] কাজ সেরে রাখতে হয়। যোগীরা কাজ সেরে ফেলেন দেখেছি। তবে নিশ্চিন্তি। মনে অন্য চিন্তা রাখবে না কিনা, ঈশ্বর চিন্তা ছাড়া। (৮/১৭৮)

● কাজ যা করি আমরা তা' মনের সৃষ্টি। কাজ দেখে মনের অবস্থা বোঝা যায়। আলগা মনের কাজ ছাড়া ছাড়া, সুন্দর হয় না। খুব serious যারা তাদের কাজে ফাঁক নাই। তারা উঠে পড়ে লাগে। (৮/১৮০)

● কর্ম না করে উপায় নেই। তবে ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে কর। এই পথ। তিনি সঙ্গে থাকলে, সর্বদা এ কথাটা মনে থাকে, প্রকৃতি করাচ্ছে। তাহলেই নিজেকে আলাদা রাখা যাবে এই ভেবে—আমি তাঁর সন্তান, আমি তাঁর দাস। তা হলে কর্ম তাকে বাঁধতে পারে না। (৯/২৫)

● পরোপকার বুদ্ধিতে [কর্ম] করলেও কর্ম ক্ষয় হয় না। অনেকটা উপরে নিয়ে যায় বটে। কিন্তু নিঃশেষ হয় না। (৯/৪১)

● যে কর্তব্যকর্ম করে না সে কাম ক্রোধ জয় করতে পারে না। তাই যা সামনে এসে পড়ে তা' অবহেলা করলে ঈশ্বর লাভ হবে না। বড় হোক, ছোট হোক, কাজ অবহেলা করা উচিত নয়। (৯/১৩৪)

● গৃহস্থাশ্রম নিষ্কাম কর্মের স্থান। এখানে থেকেও মোক্ষ লাভ হয় যদি নিষ্কাম ভাবে কর্ম করে। ঈশ্বরই এই আশ্রমের মালিক, আমি দাসীবৎ কর্ম করছি তাঁর—এই ভাবনা সর্বদা জাগ্রত রেখে কাজ করা। (৯/১৩৯)

● সাধারণ লোকে কাজ করে নিজের জন্য। এর চাইতে উঁচু থাক যাদের তারা কাজ করে পরের উপকারের জন্য। এরও উঁচু থাক, যারা কাজ করে ভগবান লাভের জন্য। তারও উপরের থাকের কাজ, প্রত্যাদিষ্ট কাজ। তারা কাজ করে ভগবানের আদেশে। (১০/৩৪)

● ফেলে রাখতে নাই কোন কাজ অন্য লোকের ভরসায়। এতে অপরের উপর নির্ভর করার mentality হয়ে যায়। নিজের initiative সর্বদা জাগ্রত রাখা উচিত সংসারে থাকতে হলে। (১১/৬)

● কাজকে ভয় করলে কাজ আরো জোরে ঘাড়ে চেপে বসে। যখন যা এসে পড়ে, তাঁর সেবা করছি ভেবে করে ফেললে কর্ম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কর্মযোগের এই রহস্য। যাতে বদ্ধ হয় তাতেই মুক্তি,

যদি ঈশ্বরকে ধরে। (১১/১১০)

● নিষ্কাম কর্মে নিজেরও চিত্তশুদ্ধি হয়, তারপর জ্ঞানপ্রাপ্তি। আবার এতে অপরেরও কল্যাণও হয়। (১৩/২৬)

● আগে পিছে স্মরণ—মাঝখানে কর্ম। এরই নাম কর্মযোগ। (১৫/৩৫৫)

প্রসঙ্গ : মানব দেহ

● এই [মানব] শরীরের ভিতর তিনটি শরীর আছে—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ। ... তিনটেকেই আহার দিতে হয়। মানুষের ইহা কর্তব্য। (১/২৮৭)

● স্থূল শরীরের আহার ... অন্নপানাদি। সূক্ষ্ম শরীর satisfied হয় intellectual persuit—এ। ... আর কারণ শরীর—এতে চাই পূজাপাঠ, জপধ্যান, বিবেক—বৈরাগ্য, জ্ঞান ভক্তি প্রেম এইসব।

কারণ শরীরকে ঠাকুর [শ্রীরামকৃষ্ণ] বলতেন ভাগবতী তনু। এই শরীর ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়, এর দ্বারা ঈশ্বর দর্শন হয়। (১/২৮৭)

সূক্ষ্ম শরীরে আহার দিলে মানুষ হয়। ... কারণ শরীরে আহার দিলে দেবতা হয়। (১/৩৩৩)

● দেখ, এই শরীরে পশু, মানুষ, দেবতা এ তিনই রয়েছে। [আহার] দিতে হয় রোজ প্রত্যেকটাতে। (১/৩৩৩)

● স্থূল দেহ থাকবে না এ বোধ first stage. তারপর সূক্ষ্মদেহ, এও অনিত্য। তারপর কারণ দেহ। এ সবের পরপর অনিত্য বলে জ্ঞান হয় তাঁকে [ঈশ্বরকে] দর্শন করলে। (১/৩৪৮)

● আমার শরীর থাকবে না ... এ ভাবটি মনে দৃঢ় হলেই তীব্র বৈরাগ্য। (১/৩৪৮)

● (স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ) এই তিনটে শরীরকে পৃথক ভাবে দেখা যায়, যোগীরা দেখতে পান। (১/৩৪৯)

● মানুষ শরীরে ঈশ্বরকে ডাকা যায়—অন্য শরীরে তা প্রায় হয় না। আমাদের শরীরের ভিতর তিনটি শরীর আছে কি না—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, তারপর মহাকারণ অর্থাৎ ঈশ্বর। কারণ শরীর মানে spiritual body —ঠাকুর বলতেন ভাগবতী তনু। এই কারণশরীরের চিন্তা কেবলমাত্র মানুষ করতে পারে। (২/১১)

● মানুষের ভিতর চারটি ভাগ আছে—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ। স্থূল বাইরের জগৎ নিয়ে থাকে; সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় মন নিয়ে থাকে। কারণ শরীরের বিষয় আদ্যাশক্তি বা চিন্তা। মহাকারণে পৌঁছুলে সব তখন একাকার। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—এর অভাব হয়। মনের তখন নাশ হয়। মন মানে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত মন, বাহ্য পদার্থ দ্বারা যার সৃষ্টি। এ অবস্থার নামই ব্রহ্মানন্দ। (৩/৪৪)

● এই স্থূল আর এই সূক্ষ্ম দিয়ে অর্থাৎ এই দেহ ও বুদ্ধি দিয়ে জানার জো নেই বিরাটকে। তাঁর চিন্তা করে করে এর উপর উঠতে পারলে অন্য রকম শরীর হয়। ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সব অন্যরকম। তা দিয়ে দেখা যায়। বোঝা যায় কতকটা সেই বিরাট বুদ্ধিকে। তাঁকে বুঝলে আর কিছু জানার আকাঙ্খা থাকে না তখন, আর বাকিও থাকে না কিছু জানবার। (৩/৩২৯)

● শরীরের যত্ন নেওয়া যতদিন দেহেতে আত্মবুদ্ধি আছে। দেহবুদ্ধি লোপ হলে তখন তাঁর [ঈশ্বরের] ওপর ভার। তিনি দেখবেন। (৩/৩৫৮)

● মানুষের ভিতর তিনটি শরীর রয়েছে, gross, intellectual and spiritual—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ। কারণ শরীরের সঙ্গে যোগ রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। (প্রাচীন) ভারতের শিক্ষার এই ব্যবস্থার জন্যই ভারতের সংস্কৃতি অত সুদৃঢ় ও উচ্চ। গুরুগৃহে [গুরুকুল শিক্ষায়?] এই তিন শরীরের বিকাশের ব্যবস্থা ছিল। (৪/৩৮)

● কেউ সেবা করে স্থূল শরীরের, কেউ সূক্ষ্মশরীরের, কেউ কারণ শরীরের। তিন শরীরের সেবাই নিষ্কাম হয়ে করলে চিত্তশুদ্ধি হয়। তখন ঈশ্বরে শুদ্ধ জ্ঞান ভক্তি লাভ হয়। (৪/২০৭)

● এক স্থান থেকেই এসেছে সবটা আনন্দ—ভোজনানন্দ থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মানন্দ। দেহ ধারণ করলে মাঝে মাঝে এদিককার আনন্দও দরকার। নইলে দেহ থাকে না। আবার মনটি একটানা ব্রহ্মরস সহ্য করতে পারে না। এমনি করে তিনি এই কলটি [দেহটি] বানিয়েছেন। (৪/২৪৪)

● কারণ দেহকে ভাগবতী তনু, যোগ দেহ বলে। এই কারণ দেহে মহাকারণের (ব্রহ্মকে) দর্শন হয়। শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে সর্বদা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকার অভ্যাস করতে করতে ঐ ভাগবতী তনুর বিকাশ হয়। সমস্তটা জীবন দিয়ে তাঁর উপাসনা করা চাই। সকল কাজ দিয়ে তাঁর আরাধনা চাই—'তৎকুরুষ্ব-মদর্পণম'। তবে ভাগবতী তনুর জন্ম হয়, আর তাতে ঈশ্বরকে জানা যায়। (৪/২৪৬)

● স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—মানুষের এই তিনটে শরীর। এদের রক্ষার জন্য যা যা দরকার সব ঈশ্বর করে রেখেছেন। (৪/২৬৬)

● এই দেহে আত্মার নিবাস তাই [দেহের] যত্ন নেওয়া আত্মার দর্শনের জন্য। আত্মদর্শনের পর যদি শরীর থাকে তা প্রারব্ধ ভোগের জন্য, অথবা লোকশিক্ষার জন্য ভগবান রেখে দেন। (৫/৪)

● সব থেকে বড় বিপদ হল দেহবুদ্ধি। sense-world—টাই বিষয়। মা যতদিন রেখেছেন দেহ বুদ্ধি ততদিন তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়—"বিপদ নাশ কর মা।" (৫/৩২)

● এই মানুষ দেহে তাঁর [ঈশ্বরের] দর্শন হয় (৫/১৬৪)

● শরীর থাকবে না। মৃত্যুকে জয় করা মানে শরীর থাকবে না এটা বোঝা। তাহলে যা চিরকাল থাকবে তাতে মন যাবে—আত্মায়, ভগবানে। (৫/২৩৫)

● মৃত [নশ্বর] শরীরে আত্মার দর্শন, এই শেষ কথা। (৫/২৩৬)

● শরীর থাকবে না এটা ভালো করে বোঝার নামই মৃত্যুঞ্জয় [হওয়া?]। সবই তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে—সর্বদা এই চিন্তার নামই মৃত্যুঞ্জয় [হওয়া?]। কারণ মৃত্যুকে সে অবস্থায় কেহ আর ভয় করে না। ভাবে, এও ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। ঈশ্বর সর্বমঙ্গলময়। মৃত্যুও মঙ্গলের জন্য। (৬/১৩৭)

● মানুষটা কি? কতকগুলি চিন্তার সমষ্টি মাত্র। (৭/১৫১)

● স্থূল থেকে সূক্ষ্ম ভালো, তার চাইতে কারণ ভালো, কারণ থেকে মহাকারণ ভালো। তাই লৌকিক বিদ্যায় সূক্ষ্মে মন রাখা ভালো। (৭/১৫২)

● মানুষের পেটের চিন্তা না থাকলে সর্বদাই ঊর্ধ দৃষ্টি থাকতো। এই পেটের জন্য মানুষের নিম্ন দৃষ্টি। (৮/৩৮)

● যে কাণ্ড macrocosm (ব্রহ্মাণ্ড)—এ চলছে, তাই microcosm এও (ভাণ্ডে, জীবে) চলছে। (৮/৬১)

● মানুষকে [ঈশ্বর] কি শক্তি দিয়েছেন দেখ না। নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে ডাকলে তার আর একটা চক্ষু হয়। তাকেই বলে দিব্য চক্ষু। তা দিয়ে ঈশ্বরকে দেখতে পায়। সেই চক্ষুটি থাকে কারণ শরীরে। ঠাকুর বলতেন ভাগবতী তনু—spiritual body—এই দর্শনটি হলে মানুষ কৃতকৃত্য হয়ে গেল। (৮/১০০)

● যার individuality আছে (অর্থাৎ অহঙ্কার আছে) সেই জীব। এই জীবত্ব নাশ হয় দিব্য চক্ষু লাভে। একেই চিত্তশুদ্ধি বলা হয়। যোগীদের এই দিব্যচক্ষু লাভ হয়। তাঁরা অনন্তের এই veil ছিন্ন করেন দিব্যচক্ষু সহায়ে। দিব্যচক্ষু বা চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞান প্রাপ্তি বা অহঙ্কার বিনাশ, আর মুক্তি বা জন্ম—মরণ শৃঙ্খল ছিন্ন করা—এ অবস্থা একই সময়ে প্রাপ্তি হয়—একই কথা। (৮/১০১)

● এই body—টাকে 'আমি আমার' বললেই যত দুঃখ যত ভয়। আর ঈশ্বরকে, আত্মাকে 'আমি আমার' বললে হয় অভয়, প্রশান্ত, আনন্দময়। (৯/১০১)

● মানুষের শরীরটা এই ধাতে তৈরী। এতে একটু খাবার পড়লে ভিতরের আত্মা জাগ্রত হয়। না পড়লে শরীর থাকে না। আবার বেশী পড়লেও চাপা পড়ে যায়। (৯/১৭৩)

● পরমাণু সমষ্টিই মন—সূক্ষ্ম পরমাণু। তার উপরের [ভিতরের?] শরীরটি কারণ শরীর। এটি তার চেয়ে আরও সূক্ষ্মতর, পবিত্রতর। অধিকতর স্থায়ী পরমাণুতে গঠিত। একে ঠাকুর ভাগবতী তনু বলতেন। এই ভাগবতী তনু জাগ্রত হয়ে ওঠে জীবন্ত শক্তিশালী দিব্য পরমাণুর সংস্পর্শে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরটি এই দুর্লভ অপার্থিব বস্তুতে পরিপূর্ণ। (১০/৪৯)

● এই শরীরটাই যে একটা সংসার—সকল দোষের আশ্রয়স্থল। শরীর ধারণই মহাদোষ। (১০/৭২)

● এই শরীর ভোগ্য দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না। তাই ব্যবস্থা, কম ভোগ নেও [নাও]। Enjoy to live, not live to enjoy. যাতে প্রাণ বাঁচে ততটা নেও [নাও]। আর বাকী সময়, শক্তি, চেষ্টা ব্যয় কর—ঈশ্বরই সব হয়ে আছেন এটা জানতে। (১২/১২০)

প্রসঙ্গ : মন এবং বুদ্ধি

● অনেক লোকের ঘর থাকতে নেই—একা থাকতে হয়। আলাদা ঘরে থাকলে সব সময়ই মনটা আপনাতে থাকে। (১/২২৭)

● Perfect detachment from the sense world. সংসার ভুলে যাওয়া। এটি হয় মনে। শুদ্ধ মন ত্যাগের আশ্রয়। (৩/৪৭)

● মন যখন সম্পূর্ণ রূপে শুদ্ধ হয় তারই নাম ত্যাগ। ত্যাগই ব্রহ্ম। (৩/৪৭)

● সংসারের নানান ঘাত প্রতিঘাতে মানুষের মন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেবলমাত্র সেই মন স্থির থাকে যে মনের আশ্রয় ভগবান স্বয়ং। (৪/২২৫)

● মনের নাশ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। মনের নাশ হয় কখন? যখন বাসনা যায়। যখন ষোল আনা মন ঈশ্বরময় হয়ে যায়। তখন বাসনা যায়। একেই বলে মনের নাশ। এরই নাম জ্ঞান। (৪/২২৯)

● মনের নাশ, চিত্তশুদ্ধি আর জ্ঞান একই কথা। (৪/২২৯)

● ঈশ্বরে ভালবাসা এলে মন আপনিই স্থির হয়ে যায়। এটা হল natural path, সহজ পথ। (৪/২৭৫)

● যাদের মন সংসার ভোগে আসক্ত তারাই শূদ্র। এই শরীরে দেরি হয় ঈশ্বর লাভ, কিন্তু হবে সকলেরই। (৫/২)

● মনকে রূপরসাদি থেকে তুলে নেওয়ার নামই চিত্তশুদ্ধি। (৫/৩৩)

● তাঁর [ঈশ্বরের] দর্শনের পরও মনের অবস্থা বদলায়। মনের স্বভাবই এই। কিন্তু তখন আর পথভ্রষ্ট করতে পারে না। কিন্তু বদলানো মনের ধর্ম। (৫/৫৭)

● Mind is the aggregate of external sensations. তাই মন পঞ্চভূতাশ্রিত। (৫/৬৯)

● মানুষের মন একটা। দুটো জিনিষে যেতে পারে না একই সময়ে। ঈশ্বরে গেলে জগতে নাই। আবার জগতে গেলে ঈশ্বরে নাই। (৫/২২০)

● অনন্ত কালের বন্ধু ভগবান, আর জগতের সব দুঃখময়, সুখ—শান্তির একমাত্র আশ্রয় ঈশ্বর এই কথা যে বুঝেছে, ঠিক ঠিক তার বুদ্ধি। (৫/২৫৭)

● মনই সব। মন যেখানে তুমিও সেখানে। (৬/২৮)

● মানুষের মন concrete (বাস্তব) ছাড়া চিন্তা করতে পারে না। তা থেকেই rituals (লোকাচার) পূজা পার্বণের সৃষ্টি হয়েছে। (৭/১০৪)

● মনের এক পারে সংসার, অপর পারে ঈশ্বর। অতবড় প্রসার মনের। ঈশ্বর চিন্তাতে মন শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ মনে তাঁর দর্শন হয়। (৮/৩৭)

● মন তো একটা। মনোযোগও একটাই। এখন সেটাকে যেদিকে চালিয়ে দাও, সে দিকেই যাবে। (৮/১৩৩)

● বুদ্ধিতে মাঞ্জা দিতে হয়। ঘসতে ঘসতে [বুদ্ধি] নির্মল হয়, তীক্ষ্ন হয়। সেই মাঞ্জা দেওয়া বুদ্ধি দিয়ে উল্টো বুদ্ধি—সংসার বুদ্ধি ছেদন করা যায়। (৮/১৪৯)

● অপর সব বুদ্ধি দুর্বুদ্ধি। কেবল ঈশ্বর বুদ্ধি, মোক্ষের বুদ্ধিই সুবুদ্ধি। (৮/১৪৯)

● সংসারের যে কোন বস্তুতে মন থাকলেই অশান্তি। অথচ মন যতদিন আছে ততদিন কোন বস্তুর আশ্রয় ভিন্ন থাকতে পারে না। (৯/১৬)

● সাধনভজন যা কিছু করে লোক, তার উদ্দেশ্য মন মুখ এক করা। (৯/৮২)

● মন তৈরীর জন্যই যত সাধন ভজন। গৃহের কাজেও এই মন তৈরী হতে পারে। (৯/১২২)

● যেখানে অনেকক্ষণ ধরে মন থাকে, সেখানকার রঙ্গে মন রাঙ্গিয়ে যায়। (৯/১৭৭)

● স্বপাক ভোজনে মন শুদ্ধ হয়। (১০/৬)

● যে মন সংসার ভাবতে ভাবতে সংসারী হয়ে যায়, সেই মনই ঈশ্বর ভাবতে ভাবতে ঈশ্বর হয়ে যায়, এইটে হল মনের ধর্ম। (১০/২৩)

● ভাব মানে শক্তি। এই শক্তি ধরে ধরে মনকে শেষে মহাশক্তিতে নিয়ে যায়। (১০/৩২)

● মুখস্থ করতে করতেই মনস্থ হয়। বারবার বলতে বলতে কথা, নিজের কানে প্রবেশ করে। তা থেকে যায় মনে। রোজ রোজ বারবার মনে একটা idea—র ধাক্কা লাগলে সেখানে দাগ পড়ে যায়। একেই সংস্কার বলে। (১০/৪৪)

● সব নির্মল থাকবে। তবে মনটি হবে নির্মল, যেমন আয়না। তাতে পড়বে ঈশ্বরের ছাপ। (১২/৪২)

● [ঈশ্বরের প্রতি] প্রেম হলে এর ভিতর দিয়ে [মন] বের হয়। এ অবস্থায় মনের বাজে খরচ হয় না। এ অবস্থায় কখনও [মন] চঞ্চল হলেও যোগভ্রষ্ট হয় না। (১৪/৭৩)

● ব্রহ্মদর্শন মানে বৃহৎকে দর্শন।—তা করতে হলে মনটিকে বৃহৎ করতে হবে। বৃহৎকে বৃহৎ মনে দেখা। (১৪/১৩৭)

● তাঁর [ঈশ্বরের] একটু প্রসাদী নির্মাল্য, কি চরণ রেণু স্পর্শ করলেও তাঁকে স্পর্শ করা হল। তিনি তো বাইরের কিছু চান না। চান কেবল মনটি। মনেতে যাঁর সর্বদা তিনি বিরাজমান তাঁর পক্ষে এ সবের দরকার নাই। (১৪/১৯৬)

● কর্মযোগ যার মন স্থির হয় নাই তার জন্য। যার মন স্থির হয়েছে তার জন্য ধ্যান যোগ। (১৫/৩৫৫)

প্রসঙ্গ : মায়া এবং মহামায়া

● বিষয়ের নামই মায়া। (২/৫)

● ভক্ত : এত জেনে শুনেও কেন ভুল হয়ে যায় কাজের বেলায়?

শ্রীম : এটি তাঁর [ঈশ্বরের] চাতুরী—তাকেই মায়া বলে। এ না হলে যে সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির পুষ্টির জন্য, তাঁর লীলার জন্য এটি হবেই। (২/৪৭)

● যে যত ঈশ্বরের নিকটে সেই তত বেশী দেখতে পায় মায়ার এই তাজ্জব কাণ্ড। সব ভেলকি লাগিয়ে দেন। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে বোধ জন্মিয়ে দেন। (৪/৩১৯)

● মহামায়াই এই বিষয় রূপ জগৎ রূপ ধারণ করে আছেন তাঁর অবিদ্যা শক্তিতে। তাই এই ভ্রম, মমত্ব বুদ্ধি। তাঁতে [ঈশ্বরে] মমত্ব না গিয়ে তাঁর সৃষ্ট বস্তুতে মমত্ব আসে! এই অজ্ঞান তাঁরই দেওয়া। (৬/১৮৫)

● সব ভুলিয়ে দেন মহামায়া। আবার তিনিই সময়ে চৈতন্য করিয়ে দেন। (৭/৭৩)

● প্রারব্ধ ভোগ সকলের করতে হয়, জ্ঞানীরও...। প্রারব্ধ ভোগের উপর রয়েছেন ব্রহ্মশক্তি, মহামায়া। তিনি যা ইচ্ছে করেন তাই হয়। তাঁর হাতে সব। (৭/২২৩)

● তিনি (ব্রহ্মশক্তি মহামায়া) প্রারব্ধও ক্ষয় করে দিতে পারেন, আবার নূতন প্রারব্ধও লাগিয়ে দিতে পারেন। (৭/২২৩)

● যেমনি তাঁর [ঈশ্বরের] অবিদ্যামায়া সংসারে আবদ্ধ করে, সেই রূপ তাঁর বিদ্যামায়া জীবকে সেই সংসার মায়া থেকে মুক্ত করে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। (৮/৩৪)

● [মহামায়া] সত্যের ঠিক উল্টো দিকে মনকে চালিয়ে দিচ্ছেন। সত্য—তিনিই [ঈশ্বরই] সব ; অসত্য—আমি সব। এ দুটোর ঝগড়াই জগৎ। এটি করছেন তিনি [মহামায়া]। (৯/১০০)

প্রসঙ্গ : যোগ এবং যোগী

● কাজের সময় কাজ; বাকী সময় ঠাকুরের কথা নিয়ে থাকলে সর্বদা যোগে থাকবে। (১/২৬)

● যোগীদের আহার যুক্তাহার। বেশীও না, অতি অল্পও না, অথচ খুব simple and substantial সহজে যা হজম হয়। (১/৩৭)

● যোগী মানে যে [যিনি?] মনকে বশীভূত করেছেন। মন যাঁর বশ, যিনি মনের বশ নন। "In the world but not of the world"—জ্যান্তে মড়া [মরা?]। (২/২০০)

● শুদ্ধ চিত্তেই ঠিক যোগ হয়। (৫/৩০)

● যোগীদের [ঈশ্বর লাভের] পথটা direct, আর যোগ ভোগের পথ gradual. (৫/১০২)

● যার এদিকে [সংসারের দিকে মনোযোগ] হয়, তার ও [ঈশ্বরের] দিকেও হয়। মোড় ফিরিয়ে দিলেই হল। তবে আনন্দ চাই। আনন্দ না হলে যোগ হয় না। (৭/১৪০)

● যাঁরা যোগী তাঁদের দৃষ্টি সর্বদা ঊর্ধদিকে। মানে, ভগবান ছাড়া তাঁদের আর কোন দিকে লক্ষ্য নাই—আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত। (৮/৪৫)

● যোগ মানে কি? না, এদিককার distractionগুলি থেকে মনকে উঠিয়ে অন্যদিকে অনুকূল বাতাবরণে নিয়ে যাওয়া। একেই বলে যোগ। সংসার থেকে মনকে উঠিয়ে নিয়ে ঈশ্বরে লগ্ন করা। বহু চিন্তা থেকে এক চিন্তাতে লগ্ন করা। (১১/১৪৫)

● ঈশ্বর, জগৎ আর 'আমি'—এ তিনটে বস্তু। 'আমি'টা আছে বলে জগৎ বোধ, জগৎ বোধে সুখ দুঃখ বোধ। এই 'আমি'টা ঈশ্বরের সঙ্গে এক করে দিলেই দুঃখ বোধ চলে গেল। এই করার প্রক্রিয়াকে বলে জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ। (১৩/৬৩)

প্রসঙ্গ : জ্ঞান এবং জ্ঞানী

● আমি ঈশ্বরের সন্তান, তাঁর স্বরূপ, এ বুদ্ধিই জ্ঞান—বৃহৎ বুদ্ধি। (১/৩২২)

● জ্ঞানী মানে যারা সংসারের কিছুই চায় না। কেবলমাত্র ঈশ্বরকে চায়। ঈশ্বর বই কিছুই নেবে না। (৩/৬)

● ব্রহ্মজ্ঞান মানে ছোট আমিটা ছেড়ে বড় আমিতে ডুবে যাওয়া। (৩/৪৭)

● They know that nothing can be known—যারা বুঝেছে যে কিছুই বুঝতে পারি নাই—তাদেরই বলে জ্ঞানী। (৩/৩২৯)

● একটা সুখ আছে, সেটা একটানা সুখ। তার সঙ্গে দুঃখ নাই। তত্ত্বজ্ঞানী কেবল ঐ সুখ চান। তারই নাম ব্রহ্মানন্দ। (৪/১৪৪)

● সেবা না করলে জ্ঞান লাভ হয় না। (৪/২৪১)

● জ্ঞানের definition, এই জানা, ঈশ্বর অজ্ঞেয়, তাঁকে জানা যায় না। পূর্ণভাবে যে এটি জানে তার কাছে জ্ঞান স্বরূপ ঈশ্বর প্রকটিত হন। যে জানবে তার ইচ্ছায় তাঁকে জানা যায় না। যাঁকে জানবে কেবলমাত্র তাঁরই ইচ্ছায় তাঁকে জানা যায়, এইটি জ্ঞান। (৭/৫৭)

● সবই আদ্যাশক্তি থেকে হয়েছে। আদ্যাশক্তিই এই সব দেখাচ্ছেন। অর্থাৎ জগৎ মনে। আদ্যাশক্তি অন্তরে আবার বাহিরে। তিনিই বুদ্ধিকে চালনা করেন অন্তর থেকে। তবেই মানুষ করতে পারে। যে এটা জেনে করে তাকেই জ্ঞানী বলে। (৮/২৮২)

● আমি ঈশ্বর, আমি 'নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত' স্বভাব, কিংবা আমি অমৃতের সন্তান—এই সব ভাব জ্ঞান। (১৪/১৪৭)

● ব্রহ্মজ্ঞানকে আদর্শ না রাখলে বাইরের জ্ঞান লাভ মানুষকে শান্তি সুখ দিতে পারে না। মানুষের চরিত্র himalayan basis—এর উপর খাড়া থাকতে পারে না। (১৫/১৫৭)

প্রসঙ্গ : ত্যাগ

● ভোগ কে করতে পারে? যার সব ত্যাগ হয়েছে, যার ভগবান দর্শন হয়েছে। এর আগে সব ছাড়তে হয়। (২/৬)

● সংসার ত্যাগ বড় কঠিন। সংসার ত্যাগ মানে ঈশ্বরকে গ্রহণ। ঘরে থেকেও তা হতে পারে। (২/১৯১)

● [ভক্ত] অমৃত : কর্ম কখন ত্যাগ হয়, এর চিহ্ন কি?

শ্রীম : ব্যাকুলতা। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হলেই বুঝতে হবে কর্মত্যাগ হচ্ছে। (৩/৩৪)

● সোজা কথায় ত্যাগ করতে হবে কর্মের ফলটি। এই ত্যাগের এমনই অমোঘ ফল উহা সত্যের দিকে টেনে নেবে, ভগবানের দিকে। (৯/৪১)

● তা [ত্যাগ] ঈশ্বর করিয়ে নেন। মানুষ কিছু করে না। কিন্তু বলে আমি করেছি। তিনি বুঝতে দেন না। কেউ কেউ বুঝতে পারে তাঁর কৃপায়। তিনি ত্যাগ করিয়ে নিলে ত্যাগ হয়। (১০/৮)

● শুধু বুদ্ধি দিয়ে মেরে দিব, বললে হয় না। বিদ্যায়ও হয় না। ত্যাগ চাই। ত্যাগের উল্টো পিঠই অনুরাগ, মানে ঈশ্বরে ভালবাসা। (১২/১৯৩)

প্রসঙ্গ : ভিক্ষা

● যে সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে সেই ভিক্ষা করতে পারে। আর পারে ব্রাহ্মণ শরীর যাদের তারা। কত স্বাধীন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম চিন্তা করে সর্বদা। (৬/২৮৮)

● ভিক্ষা করলে অহঙ্কার কমে যায়। তখন সত্যিকার অহঙ্কারটা জাগ্রত হয়। তখন দেখে, আমি তাঁর [ঈশ্বরের]। ভিক্ষা করা মানে ভগবানের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ানো, প্রার্থনা করা শরীর ধারণের উপকরণের জন্য। এতে নিচের আমিটা sublimated হয়। (৮/১৮৯)

● ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করে খেলে ভগবান তুষ্ট হন। যে ভিক্ষা করতে শিখেছে সে জগৎ জয় করেছে। (১১/১০৬)

● ভিক্ষার উদ্দেশ্য দুটি—প্রথম উদরপূরণ; দ্বিতীয় মান অপমানে চিত্তের সমতা অভ্যাস। (১১/১০৭)

● সুখ দুঃখ দুই—ই সমান বোধ হয় ভগবান দর্শনে। তাই সাধকের অবস্থায় এই সব [ভিক্ষা ইত্যাদি] ভগবান দর্শনের সাধনা। (১১/১০৭)

● [সাধক/ভক্তদের ভিক্ষা রূপ সাধন প্রসঙ্গে] ক্ষুধারূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে, অতি দীনভাবে ভগবানের দরজায় উপস্থিত হওয়া ঐ ব্যাধি দূর করার জন্য। এরই নাম ভিক্ষা। (১৪/১৩৯)

প্রসঙ্গ : তীর্থ

● আজকাল [বেলুড়] মঠ আর দক্ষিণেশ্বর [কালীমন্দির]—এ গেলে অন্য কোন তীর্থে যাওয়ার দরকার হয় না। ... তীর্থে যায় কেন? উদ্দীপনের জন্য। আর এ সব স্থানে ভগবানের পূর্ণ আবির্ভাব। সশরীরে এসে এতকাল রইলেন। (৩/২)

● তীর্থে গেলে অন্ততঃ তিনবার পরিক্রমা করা উচিত। পরিক্রমা মানে হল, ঘুরে ফিরে দেখা। তা হলে ভাল মনে থাকবে। (৪/১১৬)

● আমি অমৃতের সন্তান, আমি ঈশ্বরের দাস, কিংবা আমি ঈশ্বর—এই সব দৈবী ভাব তীর্থে জাগ্রত হয়, তীর্থের পবিত্র সংস্পর্শে। (৯/৫৬)

● [তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে] তপস্যার ভাবে যেতে হয় এইসব [দেওঘর, পুরী ইত্যাদি] মহাতীর্থে। শরীরটা রক্ষা হয় যতটায়, ততটা [জিনিষপত্র, টাকাকড়ি ইত্যাদি] নেওয়া। দেহের আরামের জন্য নয়—মনের শান্তির জন্য, ঈশ্বর চিন্তার জন্য যাওয়া। (১৪/১০)

● তীর্থ মানে কি? না, যেখানে গেলে ভগবানের উদ্দীপন হয়। তা যার কাছে গেলে তাঁর [ঈশ্বরের] উদ্দীপন হয় সেখানেও তীর্থ। (১৪/৬৯)

● কেন ঈশ্বর তীর্থ রূপে প্রকটিত হন? না, সংসার—দগ্ধ জীবগণ এসে জুড়াতে পারবে বলে—যেন ওয়েসিস মরুভূমিতে। এখানে জ্ঞান ভক্তি জ্বলজ্বল করছে। (১৪/২২২)

প্রসঙ্গ : বিবিধ

● মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়। তা হলে মৃত্যুভয় যায়। (১/১৩৮)

● লাভের প্রত্যাশা থাকলেই ভয়। (১/২৬৩)

● ভগবানের নাম, তাঁর গুণ কীর্তন এই তো ভাগবত—এই উপনিষদ। ... যাতে ঈশ্বরে মন যায় তার নামই উপনিষদ। (১/২৯০)

● বিপদে পড়লে পুরুষকার বৃদ্ধি হয়, ঈশ্বরে বিশ্বাস বাড়ে। (১/৩১০)

● বাইরে থেকে মনে হয় বিশ্ব automatic [চলছে], কিন্তু তা নয়। সব তাঁর [ঈশ্বরের] ইচ্ছাতে চলছে। এইটি বুঝতে পারলেই problem প্রায় solved হয়ে গেল। যখন [তখন?] যে অবস্থায়ই থাকা যাক আনন্দে থাকতে পারে মানুষ। তাঁর ইঙ্গিতে সব চলছে, এটা ভুলে যাওয়া যত সব দুঃখের কারণ। (২/১৬)

● যতক্ষণ ভোগ রয়েছে ততক্ষণ তাঁকে [ঈশ্বরকে] ভাল লাগে না। ভোগান্তে তাঁর জন্য ব্যাকুলতা হয়। তখন তাঁকে ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। এরই নাম প্রেম। (২/২৬)

● ঈশ্বরের কথা—এ যাদের শুনতে বা বলতে ভালো লাগে তাদের না শুনলে বা বললে যে প্রাণ থাকে না। (২/৩৪)

● মন্ত্র মানে ভগবান যা বলেন তাই। (২/৫৮)

● যে বিদ্যায় ঈশ্বরকে জানা যায় তাই বিদ্যা, আর সব অবিদ্যা। (২/১০৬)

● জীবন্মুক্ত মানে যিনি জীবনীশক্তি চলছে এ অবস্থায় থেকেও বুঝেছেন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা, আমি—তুমি নাই, সবই তুমি। (২/১৭৯)

● গানে মন ভগবানের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। জগতের গানের সঙ্গেও এক হয়ে যায়। (২/১৯১)

● যে ভগবানের পথের সহায়—eternal life যাঁর সাহায্যে লাভ হয় সেই প্রকৃত বন্ধু। (২/১৯৯)

● রাগ বশ করতে হয় কি করে জানো? জপ করতে হয় রেগে গেলে। আর রাগী লোককে বশ করতে হলে অগোচরে তাদের সেবা করতে হয়। তাদের কাজ করে রাখতে হয়। (৩/১১৬)

● যাদের শুচিবাই অছে তাদের এটা স্মরণ রাখা উচিত, হাত—পা ধুয়ে মুখে জল দিয়ে তাঁর নাম করলে সব পবিত্র হয়ে যায়। (৩/১৫৭)

● [সৃষ্টি ও জীব জগৎ প্রসঙ্গে] একটা বিরাট plan দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সব অনন্ত। সবটা কেউ বুঝতে পারে না তিনি [ঈশ্বর] ছাড়া। কিন্তু জীবের কাজ হয়ে যায় যদি সে নিজের ক্ষুদ্রতা ধরতে পারে সেই অনন্তের সামনে। তাহলেই তার কাজ শেষ। আর দুঃখ থাকবে না। (৩/৩২৮)

● এক [ঈশ্বর]—কে জানবার চেষ্টা করলে, এক ঠিক হয়ে গেলে ভিতরের অন্য সব আপনিই ঠিক হয়ে যায়। এক ঠিক হলে সব ঠিক। (৩/৩৩১)

● অনুরাগ থাকা চাই পাকা ঈশ্বরে। নইলে বৈরাগ্য টিকে না। (৩/৩৫৮)

● অনেকদিন ধরে যাকে ভাবা যায়, যার সঙ্গে থাকা যায়, তার সঙ্গে ভালবাসা জন্মে।

ঈশ্বরের উপর ভালবাসাও এইভাবেই হয়। অনেকদিন ধরে তাঁর চিন্তা করে করে। তাঁর সেবা করে তবে এই ভালবাসা হয়। এই শরীরেই হয়, এই একই ভাবে হয়। (৩/৩৬৪)

● সর্বস্ব দেবার প্রীতি, সে যখন তাঁর [ঈশ্বরের] কৃপায় মানুষ দেবতা হয় তখন। (৪/১৮)

● শুধু দেওয়া কিছু না নিয়ে—এ হয় যখন মানুষ দেব ভাবে উঠে পড়ে। (৪/১৮)

● পশুভাবে মানুষ খালি নেয়, দেবভাবে সর্বস্ব দেয়। (৪/১৮)

● আপন আপন পথ দিয়ে সকলে একই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাচ্ছে। তুমি তোমার পথ বেছে নাও। তা ধরে চলতে থাকো। (৪/৩২)

● এমন লোকও তিনি [ঈশ্বর] করেছেন যাদের মন কচ্ছপের ন্যায় ভিতরে থাকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে। ওখান থেকে মন বের করবে না। এদেরই বলে মহাত্মা। (৪/১৮৮)

● নিজের উপর নিজের বিশ্বাস না থাকলে সব পণ্ড। (৪/৩১৮)

● সবই তিনি [ঈশ্বর]। আবার সবই তিনি করছেন। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হচ্ছে। চুপ করে সয়ে যাওয়াই ভাল। সওয়া কি সহজ? তবে চেষ্টা করা। তাঁর ইচ্ছা হলে সইবার শক্তিও এসে যায়। (৪/৩২৫)

● গীতার মতে ব্রাহ্মণের আটটি গুণ—শম, দম, তপ, শৌচ, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য। এই গুণ যার ভিতর থাকে সেও ব্রাহ্মণ, তা যেখানেই জন্ম হোউক। (৫/২)

● যার শেষ হয়ে গেছে ভোগ পূর্ব জন্মে, কিম্বা সামান্য বাকী আছে, তাদেরই ঈশ্বরে মন যায়। (৫/৩)

● যে শ্রদ্ধাবান হয় তার self respect জন্মে—"আমি ঈশ্বরের—সংসারের নই"—এই জ্ঞান। তখন আর ভয় নেই। (৫/৩)

● ভোগ করতে ইচ্ছে হচ্ছে, বেশ তাঁর নামে নিবেদন করে তাঁর [ঈশ্বরের] প্রসাদ পাও। যাতে বন্ধন হত, তা মুক্তির উপায় হল। (৫/৩৪)

● প্রতীচি প্রাচ্য দেশ থেকে কি শিক্ষা লাভ করতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীম: এই মহাশিক্ষা—ঈশ্বর আছেন, মানুষ তাঁকে দর্শন করতে পারে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারে। (৫/১২২)

● ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে আপনিই প্রকাশ পায় দৈবীগুণ।... দৈবীলোক কর্মক্ষেত্রে uncompromising (নৈতিক বিষয়ে অটল)। (৫/১৬০)

● চতুর্বিংশতি তত্ত্বময় এই জগৎ সম্মুখে দেখছে মানুষ। যার বিষয় ভোগের মাদকতা কমে গেছে অনেকটা, তার এ প্রশ্ন জাগে—কোথা থেকে এগুলি এলো, কেন এলো, কে করেছে এসব। (৫/১৬৩)

● সুখ কে না চায়। তবে যে বুদ্ধিমান সে সুখের খনি চায়, অফুরন্ত সুখ অর্থাৎ ঈশ্বরকে। বিষয়ের সুখ এক কণা সুখ, বুদ্ধিমান তা চায় না,—চায় সুখ —স্বরূপকে। (৫/১৬৪)

● জীবের অহঙ্কারটিই জালা—greatest riddle of the universe. এটি দিয়ে [ঈশ্বর] বিশ্ব চালাচ্ছেন। যার অহঙ্কার নাই, তার নিকট জগৎও নাই। (৫/১৭১)

● ঠিক ঠিক শান্তি, নির্ভরতা, বিশ্বাস হয় [ঈশ্বর] দর্শন হলে। (৫/১৮০)

● যে আমিতে পতন, আবার সেই আমিতেই তাঁকে [ঈশ্বরকে] লাভ হয়। (৫/১৮৩)

● বিচার করে কিছুই হবে না, কিছুই না, দেখিয়ে দিলে হয়। তিনি [ঈশ্বর] যাঁদের দেখিয়েছেন তাঁদের কথায় বিশ্বাস কর। তারপর বিচার কর। (৫/২১৬)

● যেমন গঙ্গার শেষ সাগর, তেমনি চিত্তশুদ্ধির শেষ ঈশ্বর। (৫/২২০)

● আহা, ভালবাসা ছাড়া প্রাণ বাঁচে না। ভালবাসা অমনি জিনিষ। (৬/৪৫)

● খোলা ছাদে মনটি যেমন হয়, তেমন হয় না ঘরে। ঘরে মন বদ্ধ হয়। এখানে এলে মুক্ত। (৬/২৩২)

● স্নেহ ভগবানের পথের বিঘ্ন, সকলেরই, তবে সাধুদের বিশেষ করে। এই স্নেহ দিয়ে ভগবান জগৎকে বেঁধে রেখেছেন। (৬/২৪১)

● যে যত বেশী জানে তাঁকে [ঈশ্বরকে] আপনার লোক বলে সে সংসারের আকর্ষণ থেকে তত মুক্ত। (৬/২৪৩)

● [দীর্ঘদিন] এক স্থানে থাকলে দ্রব্য, স্থান ও ব্যক্তির জন্য মোহ হয়। (৬/৩০৬)

● বিবেক বৈরাগ্য শিক্ষা হয় না ব্রহ্মচর্য আশ্রমের শিক্ষা না পেলে। বিবেক মানে সৎ—অসৎ বিচার। তিনিই [ঈশ্বরই] নিত্য আর সব অনিত্য। (৭/১০)

● [যদি] ঐ দিকের [ঈশ্বরের] ঐশ্বর্য চাও তবে এদিককার [সংসারের] সব ছাড়তে হবে। দুটো এক সঙ্গে চলে না। তাঁর [ঈশ্বরের] দর্শন হলে, তাঁর আদেশ হলে সংসারে থেকেও কেহ কেহ ঐ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। (৭/২৩)

● সত্যিকার দোষ, পাপ—যা ঈশ্বর থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায়। (৭/৬৬)

● সত্ত্বগুণী মানে ভগবানে নিমগ্ন। মন অনেকটা ফর্সা হয়ে এসেছে। এবার সূর্য উঠবে। (৭/১৪০)

● ঈশ্বরের সন্তান আমি, সচ্চিদানন্দের অংশ, এ ভাব দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরমতসহিষ্ণুতা আসবে। (৭/১৫১)

● জীবত্বটা মিথ্যা, ঈশ্বর [ত্ব?] সত্য। মানুষ স্বরূপত ঈশ্বর। কেহ কেহ বলে, তাঁর দাস, সন্তান ইত্যাদি —"অমৃতস্য পুত্রাঃ"। এ সবই একই কথা। ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। ঈশ্বরের কাছে যাবে। (৭/২২৮)

● পঞ্চভূতে জীব আবদ্ধ হয়। আবার তা দিয়েই মুক্ত হয়। তাঁর [ঈশ্বরের] দিকে মোড় ফিরিয়ে দিলেই হল। (৮/ভূমিকা—৫)

● ঈশ্বরের জন্য মানুষের এই ব্যাকুলতা হয় কেন? তারা যে সম্মুখে মৃত্যুকে সর্বদা দেখছে। তাই ভাবে মৃত্যু তো এই শরীর নিয়ে যাবে। অতএব এই নশ্বর শরীর দিয়ে নশ্বর ভোগ করে কি লাভ হবে? যেই এই ভাবনা এসে যায় অমনি মন বিদ্রোহী হয়ে যায়। ব্রহ্মানন্দ ভোগে লালায়িত হয়। এরই নাম ব্যাকুলতা! (৮/৫৭)

● নামের ভিতর নামী অর্থাৎ ঈশ্বর রয়েছেন। (৮/৬১)

● আমি কাজ করছি আমার জন্য নয়, আমার পরিজনের জন্য—এই ভাবনাও মোহ, অজ্ঞান। (৮/৭০)

● পাণ্ডিত্য এক জিনিষ আর মেধা আর এক জিনিষ। মেধা মানে গুরুবাণী ও শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে আবিষ্কার করার শক্তি; ঐ ভাবটিকে ধরে থাকার শক্তি। আর নিজ জীবনে পালন করার শক্তি। (৮/৭১)

● এই চার থাক মানুষের— পশু ভোগী, সকাম ভক্ত ভোগী, যোগী—ভোগী ও যোগী। সকল জীবই শেষ কালে একদিন যোগী হয়ে মুক্তি লাভ করবে। (৮/৯৫)

● সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—সময়ের এই চার ভাগ। চার যুগে চার বর্ণের আধিপত্য হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র। গুণ ও কর্মের দ্বারা এই জাতিভেদ। এটা একটা সামাজিক ব্যবস্থা—সুশৃঙ্খলার জন্য এর উদ্ভব। সমাজ সুশৃঙ্খল হলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সুগম হয়। (৮/৯৬)

● যাঁরা ঈশ্বর লাভের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাঁদের কাজে, ত্রুটি বিচ্যুতি কম হয়। (৮/১৩৪)

● যে যাকে ভালবাসে সে তার সত্তা পায়। (৮/১৭৬)

● যারা মিতাচারী তাদের অভাব হয় না। যে অবস্থায় আছে তাতেই তারা খুশি। (৮/১৮১)

● যে দিন ভগবানের কাজে ব্যতীত হয় সেই দিনই সুদিন। এছাড়া সব দুর্দিন। এই উপার্জনই থাকবে অনন্ত কাল। আর সব উপার্জন শেষ হয়ে যাবে শরীর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে। (৮/১৯৯)

● মায়া থেকে দয়া বড়, দয়া থেকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে সেবা আরও বড়। (৮/২০৪)

● ঠিক ঠিক ভক্তসঙ্গ বহু তপস্যার ফল। (৮/২৫৪)

● যাতে আনন্দ সর্বাবস্থায় উপভোগ হয় তার জন্যই সেবা—ঈশ্বর বুদ্ধিতে সেবা। (৮/২৫৮)

● তাঁর [ঈশ্বরের] নাম, তাঁর ভাব অপরকে বলা সেবক ভাবে, গুরুভাবে নয়। ভগবান এই সব রূপে রয়েছেন। তাঁরই বাণী তাঁকে শোনাচ্ছি, আমি যন্ত্র মাত্র—এ ভাব আরোপে দোষ হয় না। নিজেকেও include করা হয়ে গেল। তখন তাঁর নাম গুণ কীর্তন হয়ে গেল। দীন ভাব তখন আসে। (৮/২৭৩)

● যখন নিন্দনীয় কার্যে মন যায় তখনও চেষ্টা করা উহা ছাড়বার। তা করলেও জোর করে নিচে নামিয়ে দেয় মনকে। তখন আর কি করবে মানুষ। তখন ভুগতেই হবে। (৮/৩০৪)

● একাগ্রমনে ঈশ্বর চিন্তা করবার চেষ্টা করলে, তখন সংশয় কি তা বোঝা যায়। (৯/২০)

● সত্য রক্ষা কেন করা? না, এই অভ্যাস দ্বারা মহাসত্য আবিষ্কার হবে বলে। সেটি কি? ঈশ্বরই আমার অনন্ত কালের আপন জন। আর সংসারে যাদের আপনার বলা হয় তারা সব পর। (৯/৫৬)

● সত্ত্বগুণের কাজ ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করা, ধর্মের বিজয় ঘোষণা করা। (৯/১০৯)

● বিচার শক্তি যার প্রখর সে নিজের ভুল ধরতে পারে সহজে। (৯/২২৫)

● যথার্থ ভালবাসা কার? না, যে ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়। এ ভালবাসার ঋণ শোধ হয় না। (১০/১০)

● যাঁরা মহাত্মা তাঁদেরই বুদ্ধি স্থির, কূটস্থ বুদ্ধি—হিলে না। একটু এদিক ওদিক হলেও আবার ঈশ্বরে এসে যায়। (১০/১৯)

● যতদিন না কথার সঙ্গে ভাবের যোগ হয়েছে, ততদিন খালি মুখস্থ করে আবৃত্তি করতে হয়। আবৃত্তি করতে করতে ভিতরে আগুন জ্বলে ওঠে। (১০/৩২)

● [দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির প্রসঙ্গে] ভগবানের দিব্য আবির্ভাবে [এখানকার] সব জাগ্রত জীবন্ত, সব শুদ্ধ প্রবুদ্ধ। এই জীবন্ত পরমাণুর প্রভাব পড়ে যারা যায় [মন্দিরে] তাদের মনের উপর। (১০/৪৯)

● প্রথম—মুক্তি চাই পাঁচ জনের হাত থেকে, জীবন ধারণের জন্য বন্ধন মুক্তি। দ্বিতীয়—মুক্তি ভোগবিলাস থেকে। তাই স্বোপার্জন, সরল জীবন ও স্বাবলম্বন দরকার। (১০/১১৭)

● যারা যা পড়েছে, চিন্তা করেছে, তাদের সঙ্গ করা, তাদের মুখে শোনা। তাহলে অল্প সময়ে বেশী জানা যায়। (১১/৩২)

● সুষুপ্তিতে মানুষ পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। তখন রাগ দ্বেষ থাকে না। যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, ঐতে ডুবে আছেন, জাগ্রত অবস্থাতেও তিনি সুষুপ্তির মত রাগ দ্বেষ অহঙ্কার কর্তৃত্ববোধ বিবর্জিত। (১১/৩৭)

● কর্তাগিরিটা অবশ হলেই সামনে মায়ের শান্তিময় কোল। (১১/৮৬)

● অহঙ্কারের জন্যই তো অবিশ্বাস, তা থেকে সংশয়। তা থেকে বিনাশ। (১১/১৪৫)

● ঈশ্বরবুদ্ধিতে সংসার করলে কিছু কম হয় শোক—দুঃখ—এই যা। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী—সব তিনিই এই রূপে রয়েছেন। এই ভাব আরোপ করলে ক্রমে দুটি সম্পর্ক হয়ে যায়, একটি স্নেহের, অপরটি শ্রদ্ধার, ক্রমে স্নেহের সম্পর্কটি কমবে, শ্রদ্ধারটি বাড়বে। (১২/১১০)

● [গৃহে থেকে] যদি মনে করা যায়, আমরা আশ্রমে আছি, ঈশ্বরই এখানকার মালিক, আমরা সকলে তাঁর সেবক মাত্র, তাহলে উহা আশ্রমই হয়ে যায়। (১২/১১০)

● নানা রূপে স্বরূপানন্দ প্রকাশ হয়। গানে হয়, বাজনায় হয়। পেন্টিংয়ে হয়, কবিতায় হয়। গদ্যেও হয়, কথায়ও হয়। আর ভাস্কর্যে হয়, নৃত্যেও হয়। (১২/১১৮)

● Interest (স্বার্থ) এমনি কাণ্ড! এতে হাত পড়লে মানুষ পশু হয়ে যায়। তখন হিতাহিত জ্ঞান চলে যায়। (১২/১২২)

● [সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে দাঁড়িয়ে] দুটি জিনিষ লাভ হয় এসব স্থানে এলে। একটি ভগবৎ ভাবের স্পর্শ, আর দ্বিতীয়টি, ঐ স্পর্শে উদ্দীপিত ভক্তগণের মুখমণ্ডল দর্শন। (১৩/৭)

● [ওঁ] এই প্রতীকটির সহায়ে ব্রহ্মদর্শন হলেই তখন ব্রাহ্মণ। আর ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলে তখন অন্য ভাব, যা সংস্কারলব্ধ, তা আর রইল না। ক্ষত্রিয়ের প্রতিহিংসা বৃত্তি, বৈশ্যের ধনাগম চেষ্টা, শূদ্রের দাসত্ব ভাব আর থাকে না। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র, বৈশ্য সমাধি আর শূদ্র রুইদাস ব্রাহ্মণ হলেন। (১৩/২২)

● ব্যবহার ভেদ থাকবেই। কেহ তা সরাতে পারেনা। তবে ভেদের ভিতর অভেদ দৃষ্টি রাখা। 'অভেদ' এক ভগবান। সব জীবে উনি বিরাজমান। সে দৃষ্টি থাকলে দয়া, করুণা, পরোপকার, শ্রদ্ধামিশ্রিত ব্যবহার হয়। এগুলি দৈবী সম্পদ। (১৩/২৪)

● যতক্ষণ জগৎ ততক্ষণ বড় ছোট ভেদ। ঈশ্বর বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে দেখতে পারলে স্নেহ, দয়া, শ্রদ্ধা এসে যায়। তাহলেই সমাজ উঁচুতে উঠতে পারে। আর এই সমাজ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। (১৩/২৬)

● ভালোবাসা না পেলে কেউ কারো কথা নেয় না। (১৩/৪০)

● প্রসন্ন হয়ে যা দেন ভগবান, তাকেই বলে প্রসাদ। উহা সপ্রেমে মাথায় তুলে নিতে হয়। কেন? না, এতে যে ভগবানের সঙ্গে মিল হয়ে যায়। তাতে অজ্ঞাতে মনের উপর কাজ হয়, চিত্তশুদ্ধ হয়। (১৩/৯৩)

● যে নিজের defect জানে তার ভয় কম। সে প্রার্থনা করবে তার হাত থেকে মুক্ত হতে। (১৪/১৩)

● [পঞ্চঋণ] দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, নৃঋণ, ভূতঋণ। যার কাছ থেকে কিছু নেওয়া হয় তার কাছেই আমরা ঋণী। একজন মানুষ, বেঁচে থাকতে হলে এই সব ঋণে আবদ্ধ হয়। (১৪/১২৯)

● [পঞ্চ ঋণ শোধের উপায় প্রসঙ্গে] নিত্য ভগবানের ধ্যান চিন্তাতে মুক্তিলাভ হয় দেবঋণ থেকে। শাস্ত্রাদি সদগ্রন্থ পাঠে শোধ হয় ঋষি ঋণ। ... পিতৃঋণ ... শোধ হয় তর্পণাদির দ্বারা। নৃঋণ শোধ হয় অতিথি সেবায়। ভূতঋণ মানে মানুষ ছাড়া অন্য জীবজন্তুর কাছ থেকে উপকার পায় মানুষ। তা শোধ হয় নিত্য তাদের কিছু খাদ্য দিলে। (১৪/১৩০)

● হাজার মহাপুরুষ হও, ঈশ্বরের ইচ্ছা না হলে সত্যরক্ষা হয় না। তিনি কাউকে কাউকে দিয়ে সত্য রক্ষা করান। (১৪/১৯৯)

● মহাপুরুষদের ঘরে তাঁদের চিন্তাধারা সঞ্জীবিত থাকে। কত চিন্তা, কত ভাব ওখানে হয়েছে। তার ছাপ থাকে। (১৪/২৭২)

● লোকশিক্ষা বড় কঠিন। ভগবানের ইচ্ছা হলে তবে হয়। মানুষের ইচ্ছায় লোকের শিক্ষা হতে পারে না। (১৫/১৫৯)

● মহাপুরুষদের ভালবাসা অবিনাশী। তাঁদের ভালবাসা পেলেই ভগবানের ভালবাসা পাওয়া গেল। (১৫/২২০)

● যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন তিনি অত্যাশ্রমী (আশ্রম ধর্মকে অতিক্রম করে গেছেন)। তাঁর জন্য শাস্ত্রবিধির প্রয়োজন নাই। তিনি গৃহে থাকলেও অত্যাশ্রমী। (১৫/২৪৯)

● ঈশ্বরের কর্তৃত্বের সঙ্গে তোমার নগণ্য কর্তৃত্বের মিলন করে দাও। দাসের কর্তৃত্ব, ভক্তের কর্তৃত্ব, পুত্রের কর্তৃত্ব নিয়ে থাক। পরমানন্দে থাকবে। (১৫/৩১৪)

● মানুষের চেষ্টায় কেবল হয়না। এই সঙ্গে তাঁর [ঈশ্বরের] ইচ্ছা মিলিত হলে হয়। (১৫/৩২০)

● যদি বলো, তাহলে কিছুই করবার নেই? তার উত্তর, তিনি [ঈশ্বর] যদি চেষ্টা দিয়ে করিয়ে নেন। তা তাঁর কাজ। তোমার দ্বারা নয়। তোমার কি সাধ্য? তুমি তাঁকে ধরো। চেষ্টাও তাঁরই। (১৫/৩৮১)

ধর্মে বিজ্ঞানে ইতিহাসে জীবনে

সিদ্ধিদাতা গণেশ

সিদ্ধিদাতা গণেশবন্দনা

খর্ব স্থূলতনুং গজেন্দবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দমদ—গন্ধ—লুব্ধ মধুপ ব্যালোল গণ্ড স্থলম।
দন্তাঘাত বিদারিত অরিরুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম।। ১।।
দেবেন্দ্র মৌলি মন্দার মকরন্দ কণারুণাঃ।
বিঘ্নান হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজঃ এণবঃ।। ২।।
একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদর গজাননম।
বিঘ্ননাশ করং দেবং হেরম্বং প্রণম্যাম অহম ৩।।